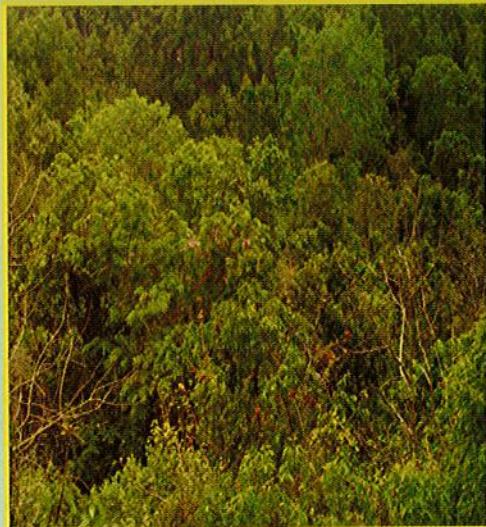
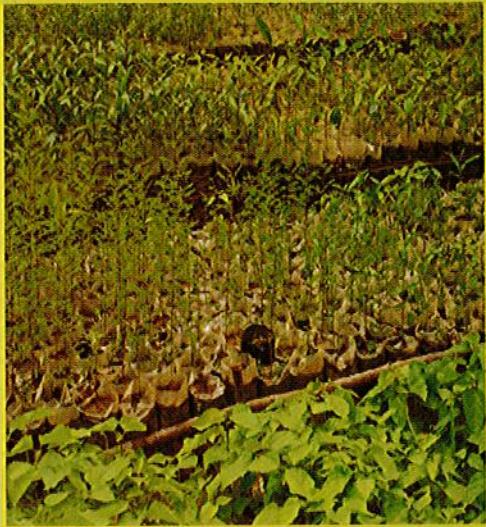
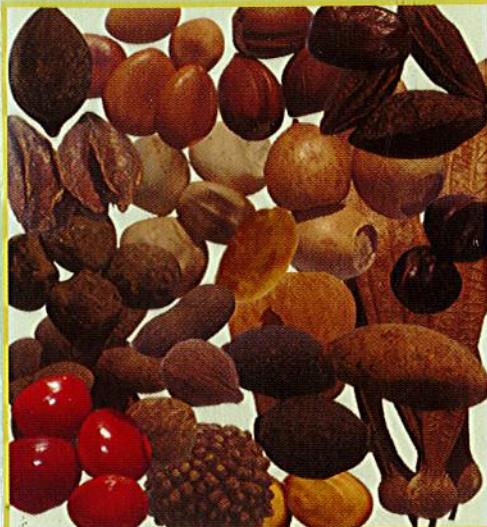


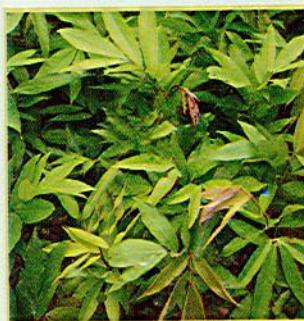
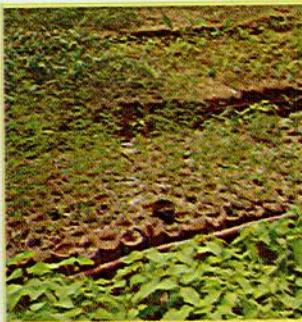
বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির নাসাৰি ম্যানুয়েল



ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ



বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির নামারি ম্যানুয়েল



ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ



বিপন্নার বৃক্ষ প্রজাতির নামারি ম্যানচেল

ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন

অধ্যাপক

ইনসিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড
এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

নির্বাহী পরিচালক

আরণ্যক ফাউন্ডেশন



প্রকাশনায়

আরণ্যক ফাউন্ডেশন

প্রকাশক
আরণ্যক ফাউন্ডেশন
বনানী, ঢাকা-১২১৩

প্রকাশকাল
মার্চ ২০০৮

অর্থায়নে
আরণ্যক ফাউন্ডেশন
বনানী, ঢাকা-১২১৩

প্রচন্দ ছবি
ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন

গ্রাফিক্স ডিজাইন
এম. জামাল হোসেন

ISBN No.: 984-300-001966-0

মুদ্রণ
আল-মদিনা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

প্রাণিস্থান
আরণ্যক ফাউন্ডেশন
নির্বাহী পরিচালকের কার্যালয়
বাসা # ৬৮, রোড # ১, ব্লক # আই
বনানী, ঢাকা- ১২১৩, বাংলাদেশ

মুখ্যবন্ধু

বাংলাদেশ এক সময়ে জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল। দেশে প্রায় ৫,৭০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ ছিল বলে বিভিন্ন তথ্যে বলা হলেও বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ নানা কারণে আমাদের জীববৈচিত্র্য হৃষ্কীর সম্মুখীন। ইতিমধ্যে ১০৬ প্রজাতির উদ্ভিদ বিপন্নপ্রায় বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা প্রকাশ করলেও অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস এ সংখ্যা আরো অনেক বেশী হবে। তাড়াতাড়ি ফল লাভের অভূতে দ্রুতবর্ধনশীল বিদেশী কিছু বৃক্ষ প্রজাতি উদ্বেগজনকভাবে দেশীয় গাছের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ ও প্রতিবেশসহ দেশীয় মূল্যবান বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডি জিনিরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরনি সম্মেলনের পরিবেশ সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৪ সালে অনুসমর্থনপূর্বক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশ্ববাসীর সাথে একসাথে কাজ করার ঘোষণা দেয়।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগের মতো বাংলাদেশ সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে দেশের ক্ষয়িগ্ন উৎপন্নগুলীয় বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে গঠিত আরণ্যক ফাউন্ডেশন বেশ কিছু কার্যক্রম শুরু করে। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের আওতায় ২০০৫ সালের শেষ দিকে “বাংলাদেশের বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি সমূহের নাসাৱি উত্তোলন পদ্ধতি” শীর্ষক প্রকল্পটি কার্যত শুরু হয়। কুকুরাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, যশোহর, নওগাঁ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ২৬ টি নাসাৱি “বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির নাসাৱি উত্তোলন” কাজে অংশগ্রহণ করে। প্রতি নাসাৱি হতে ২ জন করে নাসাৱি ম্যান প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মূল্যায়ন সভায় কাজের অঙ্গগতি ও সমস্যাবলী নিয়ে সাৰ্বকল্পিক আরণ্যক ফাউন্ডেশন ও প্রজেক্ট সদস্যদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পটি সফল সমাপ্তি লাভ করে। প্রতিটি নাসাৱি বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির কমপক্ষে ২০,০০০ টি চারা উত্তোলন পূর্বক বাজারজাত করেন। প্রজাতি সমূহের ফল ও বীজ সংগ্রহসহ নাসাৱির যাবতীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয় এবং চারাসমূহ বিক্রি ও বিতরণের হিসাবও সংরক্ষণ করা হয়। দূর্লভ ও দুর্প্রাপ্য এসব প্রজাতি সম্পর্কে নাসাৱি মালিক ও বৃক্ষরোপণে আগ্রহীদের উৎসাহ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আরণ্যক ফাউন্ডেশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তি মালিকানাধীন নাসাৱি মালিকদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় গাছের বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন ও পরিচর্যায় দক্ষতা সৃষ্টিই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

মূলত নাসাৱির তথ্যাদির উপর ভিত্তি করেই এই নাসাৱি ম্যানুয়েলটি রচিত। মাঠ পর্যায়ে নাসাৱি ম্যানদের অভিজ্ঞতা, প্রজাতির সংখ্যা ও প্রাপ্যতা বিচার করে বিপন্নপ্রায় বৃক্ষপ্রজাতি নির্ধারণ করা হয়। বেশ কিছু প্রজাতির বিস্তার দৃশ্যমান হলেও তাদের কমে যাওয়ার হার নির্ধারণপূর্বক বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি বলে বিবেচনা করা হয়। এই ম্যানুয়েলে প্রাথমিকভাবে ৫১ টি বৃক্ষ প্রজাতির বিভিন্ন তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রবর্তীতে আরো বেশ কিছু বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির তথ্যাদি সন্নিবেশ করার আশা রাখি। এসব তথ্যাদি দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতি সমূহের ফল ও বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন ও গাছ লাগানোর প্রচেষ্টাকে সহায়তা করবে বলে আশা করি।

ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আরণ্যক ফাউন্ডেশনের এই প্রকল্পটির সফল সমাপ্তির জন্য ফাউন্ডেশনের সাবেক কার্যনির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. জহরুল করিম, সিনিয়র প্রোগাম অফিসার জনাব আবু নাসের খান (বর্তমানে সহকারি প্রধান বন সংরক্ষক, বন বিভাগ), ড. এম. আবদুল কুন্দুজ, জনাব মোহাম্মদ শওকত হোসেন, জনাব আবেদুল হক চৌধুরী, জনাব এ. কে. আজাদ, উপবন সংরক্ষক (অব:) জনাব জালাল উদ্দিন আহমেদ সহ সকল নাসাৰি মালিকদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ট্রেনিং প্রোগামসহ সকল কারিগরী ও বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা, প্রার্মণ ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট, চট্টগ্রামের মূখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. এম. খায়রুল আলম, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন ও সিনিয়র গবেষনা কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মহীউদ্দিন এবং ইনসিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম. কলিমউদ্দিন ভুইয়া ও অধ্যাপক ড. এম. সফিউল আলম এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলা বানান সহ ভাষাগত দিকটি দেখার জন্য অধ্যাপক ড. আবুল কাসেম, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি চিহ্নিতকরণ, ফল ও বীজ সংগ্রহ, নাসাৰির তে চারা উত্তোলন, পরিচর্যা, বাজারজাতকরণ সহ সার্বিক তথ্যাদি সংরক্ষণ ও সরবরাহ করার জন্য নাসাৰি মালিকদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। ম্যানুয়েলে উইকিপিডিয়া হতে ৪টি ও ড. মো. খায়রুল আলম হতে ১ টি ছবি সংযোজন করা হয়েছে।

ম্যানুয়েলটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সহদয় পাঠকবৃন্দের যে কোন সমালোচনা, প্রার্মণ সাদরে গৃহীত হবে।

বাংলা টাইপের জন্য জনাব কামরুল হাসান ও মুদ্রণকাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আল মদিনা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম এর প্রতি কৃতজ্ঞ ও ধন্যবাদ জানাই।

ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১.১ সূচনা	পৃষ্ঠা
১.২ বন ও বনজ সম্পদ	০১
১.২.১ পাহাড়ি বন	০৩
১.২.২ শাল বন	০৮
১.২.৩ ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন	০৮
১.২.৪ গ্রামীণ বন	০৫
১.৩ কিছু বিশেষ ধরনের বন	০৫
১.৩.১ সমুদ্র সৈকত বন	০৫
১.৩.২ জলাভূমির বন	০৬
১.৩.৩ উপকূলীয় বন	০৭
১.৪ বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ সংরক্ষণে করণীয়	০৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণে আরণ্যক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ	০৯
২.২ বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ উত্তোলনের জন্য প্রশিক্ষণ	১২
২.৩ নার্সারি সমূহে উত্তোলিত বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির চারাসমূহের নাম	১৪

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতিসমূহের নার্সারির ধরন ও পরিকল্পনা	১৭
৩.২ নার্সারি স্থাপনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম বা ধাপসমূহ	১৭
৩.২.১ নার্সারির জায়গা নির্বাচন, জায়গার পরিমাণ নির্ণয় ও প্রস্তুতকরণ	১৮
৩.২.২ নার্সারির বেড়া নির্মাণ	১৯
৩.২.৩ চারা উত্তোলনের জন্য বেড, পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা ও অভ্যন্তরীণ চলাচলের রাস্তা তৈরি	১৯
৩.২.৪ প্রতি ব্যাগে মাটির পরিমাণ নির্ণয়	২২
৩.২.৫ বড় চারা বা নগ্ন শিকড় চারা উত্তোলনের জন্য বেড প্রস্তুত করা	২৪
৩.২.৬ পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা	২৪
৩.২.৭ মাটি, বালি, গোবর, জৈব সার, পট বা ব্যাগ, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক উপকরণ সংগ্রহ	২৪
৩.২.৮ নার্সারিতে চারা উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা	২৫

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১ বীজ সংগ্রহ, নিষ্কাশন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন ও সংরক্ষণ	২৬
৪.১.১ ভাল বীজ সংগ্রহের গুরুত্ব	২৬
৪.১.২ ভাল মা গাছের বৈশিষ্ট্য	২৬
৪.১.৩ বীজ সংগ্রহের সময় বিবেচ্য বিষয়	২৭
৪.১.৪ বীজ সংগ্রহের উৎস সমূহ	২৮
৪.১.৫ কিছু বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির বীজ সংগ্রহের সময়, অঙ্কুরোদগম কাল, কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা এবং অঙ্কুরোদগমের হার	২৯
৪.২ বীজ সংরক্ষণ	৩৩
৪.৩ বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি	৩৪
৪.৪ বপনের আগে বীজ শোধন ও বপন পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াকরণ	৩৫
৪.৫ বীজের পরিমাণ নির্ণয় ও বীজ বপন	৩৭
৪.৫.১ ট্রেতে বীজ বপন	৩৭
৪.৫.২ সিড বেডে বীজ বপন	৩৮
৪.৫.৩ নগুশিকড় স্টাম্প উত্তোলনের জন্য বেডে বীজ বপন	৩৯
৪.৫.৪ পটে বা ব্যাগে বীজ বপন	৩৯

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ নার্সারিতে চারার যত্ন ও পরিচর্যা	৪০
৫.১.১ ছায়া প্রদান	৪০
৫.১.২ সেচ বা পানি দেওয়া	৪০
৫.১.৩ আগাছা দমন	৪১
৫.১.৪ চারা শ্রেণীকরণ	৪১
৫.১.৫ মূল ছাটাই	৪১
৫.১.৬ মুক্তমূল বা মৃত্তিকা বিশিষ্ট চারা	৪১
৫.১.৭ মাটি আলগাকরণ	৪২
৫.১.৮ সার প্রয়োগ	৪২
৫.১.৯ রোগবালাই দমন	৪২
৫.২ নার্সারি ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বা রেকর্ড সংরক্ষণ	৪২
৫.২.১. নার্সারি জার্নাল	৪২

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১. কয়েকটি বিপন্নার বৃক্ষ প্রজাতির পরিচিতি ও চারা উত্তোলন পদ্ধতি	৪৪
০১. খয়ের	৪৪
০২. হলদু, কাইকা	৪৫
০৩. ছাতিয়ান	৪৬
০৪. বৈলাম	৪৭
০৫. পিতরাজ, রয়না	৪৮
০৬. আগর	৪৯
০৭. চাপালিশ, চাম্বল	৫০
০৮. বরতা, টেওয়া	৫১
০৯. হিজল	৫২
১০. কাইনজালবাদি, লউবাদি	৫৩
১১. শিমুল	৫৪
১২. পলাশ	৫৫
১৩. পূন্যাল	৫৬
১৪. সোনালু, বান্দরলাঠি	৬৭
১৫. বাটনা, শিল-বাটনা	৫৮
১৬. চিকরশি	৫৯
১৭. বরুনা, লাডুম, পিতাগুলা	৬০
১৮. চালতা	৬১
১৯. হারগাজা, আজুলি	৬২
২০. তেলি গর্জন	৬৩
২১. বান্দরহোলা	৬৪
২২. উদাল, উজাল	৬৫
২৩. বারেলা, ঝাউয়া	৬৬
২৪. তেলসুর	৬৭
২৫. চালমুগরা	৬৮
২৬. সিদা জারঞ্জল	৬৯
২৭. মেঙ্কা, মেদা	৭০

২৮. রঙ্গন	৭১
২৯. মহঁয়া	৭২
৩০. উরিআম	৭৩
৩১. নাগেশ্বর	৭৪
৩২. চম্পা	৭৫
৩৩. গাঙ্কি গজারি	৭৬
৩৪. বাশঁপাতা	৭৭
৩৫. গুটগুট্টা, নিউর, লুও-বাদি	৭৮
৩৬. মুস, মুসিগন্ধা	৭৯
৩৭. বুদ্ধু নারিকেল, নারিকেলি	৮০
৩৮. অশোক	৮১
৩৯. কনক, বোনাক	৮২
৪০. কুসুম, জয়না	৮৩
৪১. ধারমারা	৮৪
৪২. আম চুড়ুল, সিভিট	৮৫
৪৩. জাম, কালজাম	৮৬
৪৪. ঢাকিজাম	৮৭
৪৫. তেঁতুল	৮৮
৪৬. অর্জুন	৮৯
৪৭. বহেরা	৯০
৪৮. হরিতকি	৯১
৪৯. তুন, সুরঞ্জবেদ	৯২
৫০. আরশল, হরিনা, গুদা	৯৩
৫১. বাজনা	৯৪
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	৯৫

প্রথম অধ্যায়

১.১ সূচনা

বাংলাদেশ প্রথমীয়ার একটি ঘন বসতিপূর্ণ দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১০০০ লোক বাস করে। জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। জনগণের মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.১২ হেক্টর হলেও কার্যত গ্রামের ৬০ ভাগ মানুষই ভূমিহীন।

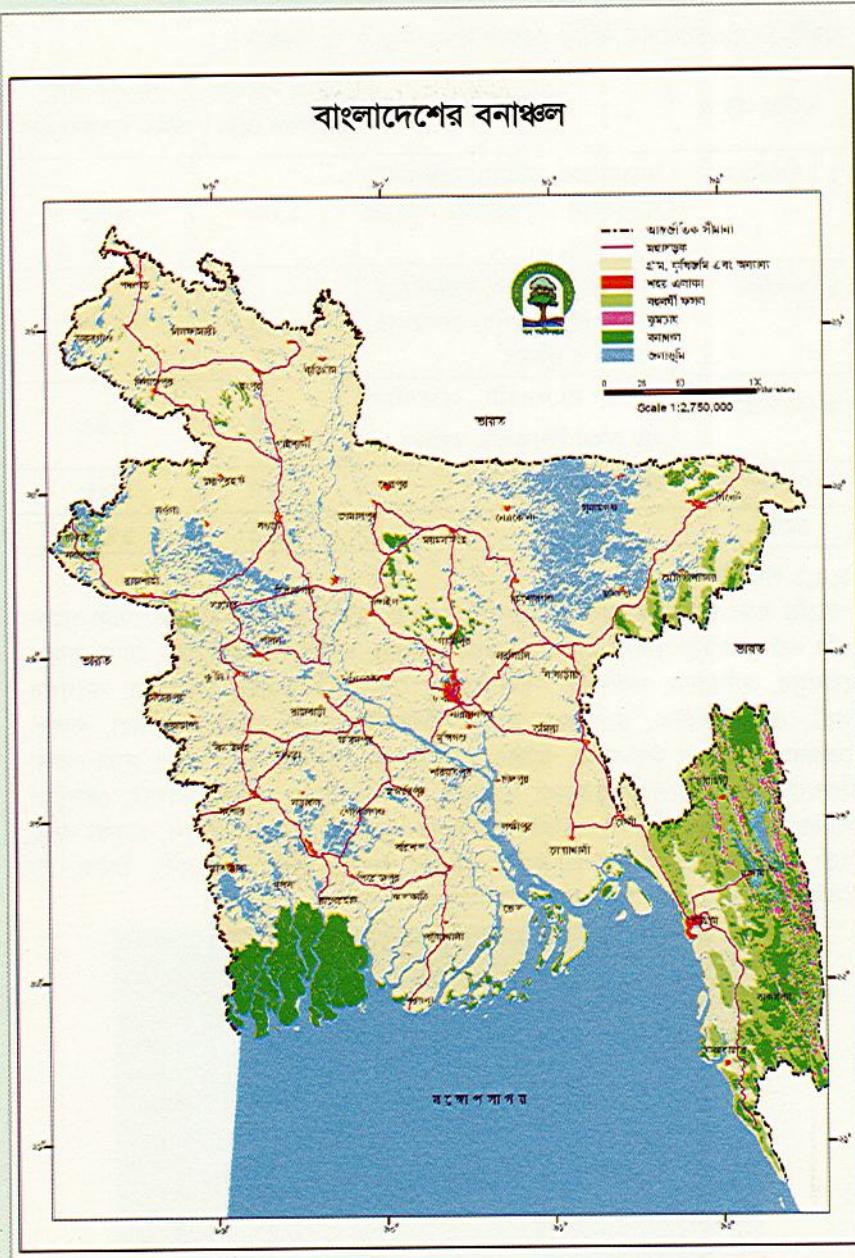
বাংলাদেশ এক সময়ে জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল। বাংলাদেশে প্রায় ৫,৭০০ সপুষ্পক উদ্ভিদ, ২৬৬ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ২২ প্রজাতির উভচর, ১০৯ প্রজাতির সরীসূ�, ৩৮৮ প্রজাতির স্থানীয় পাখি ও ১১০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী বিদ্যমান ছিল। কিন্তু দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ বিপর্যয়কারী উন্নয়ন কার্যক্রম, বন উজাড়, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক আহরণ, আবাসস্থল ধ্বংস, আগামী প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর চাষসহ নানা কারণে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। শুধুমাত্র বেশি লাভের আশায় সেগুন, মেহগনি ও আকাশমণির মত গাছের চাষ করতে গিয়ে আমাদের অনেক দেশীয় গাছপালা বিপন্ন বা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে।

কৃষি জীববৈচিত্র্যেও বাংলাদেশ একসময় বেশ সমৃদ্ধ ছিল। বাংলাদেশে প্রায় পন্থ হাজার জাতের ধান বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মিটাতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করতে গিয়ে সে সব ভিন্ন স্বাদ ও জাতের বৈচিত্র্যধর্মী ধানের জাতসমূহ আমরা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছি। ইতিমধ্যে দেশে ১০৬ প্রজাতির উদ্ভিদ বিপন্নপ্রায় বলে বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন, অনেকের বিশ্বাস এ সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে।

সারাবিশ্বে জীববৈচিত্র্য হাসের তরাবহতা উপলক্ষ করেই ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জিনিরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্মীয় সম্মেলনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সনদ স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ১৯৯২ সালে পরিবেশ সনদে স্বাক্ষরণ করে এবং ১৯৯৪ সালে অনুসমর্থন করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশ্বসৌরী সাথে এক সাথে কাজ করার ঘোষণা দেয়। আজ আমরা বিশ্বের আরো ১৯৫টি দেশের সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রতিশ্রুত ও দায়বদ্ধ। তাই অনতিবিলম্বে দেশীয় বৃক্ষপ্রজাতি সমূহ বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১.২ বন ও বনজ সম্পদ

সরকারি হিসাব মতে আমাদের দেশে মোট ভূমির শতকরা ১৭.৫ ভাগ (অর্থাৎ ২.৫৩ মিলিয়ন হেক্টর) বনভূমি। তবে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ শতকরা ৮.০ ভাগের বেশি নয়। বিস্তৃতি, প্রতিবেশ ও অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পাহাড়ি বন, শালবন ও উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন (ছবি - ১)। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্রবাজার ও সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ে যে বন দেখা যায় সেগুলিকে পাহাড়ি বন বলে থাকি। ঢাকা, গাজিপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর অঞ্চলে শালগাছ সমৃদ্ধ যে বন দেখি তা হলো শালবন এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলে (খুলনা, সাতক্ষীরা ইত্যাদি) মোনাপানিতে বিশেষ ধরনের যে বন দেখা যায় তা সুন্দরবন নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক বন ছাড়াও সারাদেশে বসতবাড়ির আশেপাশে যে গাছপালা আছে তাকে গ্রামীণ বন বলে থাকি। তুলনামূলকভাবে গ্রামীণ বনের পরিমাণ কম হলেও দেশের মোট সরবরাহকৃত চেরাই কাঠের শতকরা ৭০ ভাগ এবং জালানী কাঠ ও বাঁশের শতকরা ৯০ ভাগ গ্রামীণ বন থেকে আসে বলে এ বন আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বনের পরিমাণ ও বিস্তৃতি সারণী-১ এ দেয়া হল।



ছবি - ১: বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল সমূহের অবস্থান
(বন বিভাগের সৌজন্যে)

সারণী-১: বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বনের বিস্তৃতি ও পরিমাণ।

বনের প্রকার	অবস্থান	বনের পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	দেশের মোট ভূমির শতকরা হার
১। পাহাড়ি বন	কর্বাজার, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, বৃহত্তর সিলেট	১.৮০	৯.৭২
২। শালবন	গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও কুমিল্লা	০.১২	০.৮৩
৩। ম্যানগ্রোভ বন	খুলনা, বাগেরহাট, সাতচ্ছীরা সহ সমগ্র উপকূলীয় এলাকা	০.৭৪	৫.০৬
৪। গ্রামীণ বন	সমগ্র বাংলাদেশ	০.২৭	১.৮৮
মোট -		২.৫৩	১৭.৫

১.২.১ পাহাড়ি বন

পাহাড়ি বনে প্রাক্তিকভাবে যে সব বৃক্ষ পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে তেলি গর্জন, ধলি গর্জন, বাইট্টা গর্জন, সিভিট, কামদেব, রক্তন, চম্পাফুল, নারিকেলী, টালি, চুন্দুল, তেলসুর, ঢাকিজাম, বনশিমুল, বান্দরহোলা, বৈলাম, পিতরাজ, চালমুগরা, নাগেশ্বর, কাউ, গোদা, বাটনা, চাপালিশ, ডুমুর, শীলকড়ই, কালো কড়ই, ধারমারা, পলাশ, তেজবহল, গামার, মদনমাতা, আচার, জারঞ্জ, মুস, ছাতিম, বহাল, তুন, সুতা গোলা, বাঁশপাতা, বুরা, অশোক, বরমালা, ডাকরুম, কম, চিকরাশি, কনক, জলপাই, কেসটুমা, পানিয়াটুরী, সিদুর, খরলা, রংকাট, কানিয়ারি, ঝুমুরজা, হনসক, শিমুল, চাকুয়া করই, বর্তা, আরশল, হারগাজা, আমলকি, আমড়া, ভাদী, হলদু, শীলভাদী, উদাল, বন সোনালু, বহেড়া, কুর্চি, ভুই কদম ইত্যাদি (ছবি - ২)।



ছবি - ২: চট্টগ্রাম, দক্ষিণ বন বিভাগের টংকাবতি মিশ্র সবুজ বনাঞ্চল।

১.২.২ শালবন

শালবনে শাল অন্যতম প্রধান গাছ (ছবি - ৩)। এছাড়া অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে কুসুম, হলদু, চাপালিশ, গাঞ্জী গজারী, পলাশ, উদাল, সিধা জারুল, টেপাজাম, বহেরা, কুরচি, হরিতকি, পিতরাজ, শীল কড়ই, চাকুয়া কড়ই, শেওড়া, শিমুল, হারগাজা, আমলকি, ভেলা, পানিয়াটুরি, মেন্দা, আছার ইত্যাদি। বনভূমি দখল ও নিয়মবিহীনভাবে বৃক্ষ আহরণের ফলে এ বন উজাড় হয়েছে সব চেয়ে বেশি। এ বনের প্রজনন ক্ষমতা বিশেষ করে শাল গাছের কপিসিং ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ও মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে প্রতিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে শুধুমাত্র দ্রুতবর্ধনশীল বিদেশি আঘাসি প্রজাতির বৃক্ষ ব্যবহার করে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করায় বন অধিদণ্ডের পরিবেশবাদীদের সমালোচনায় পড়ে (ছবি - ৪)।



ছবি - ৩: মধুপুর শাল বন।



ছবি - ৪: মধুপুর শাল বনে আকাশমনি প্রজাতির সৃজিত বাগান।

১.২.৩ ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন

ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন সাধারণ বন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ বন প্রতিদিন দু'বার সামুদ্রিক জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। এ বনের প্রধান বৃক্ষ হচ্ছে সুন্দরী ও গেওয়া (ছবি - ৫)। অন্যান্য গাছের মধ্যে রয়েছে কাঁকড়া, কেওড়া, বাইন, সাদা বাইন, সিংড়া, ভেলা, পঙ্গর, ঝুন্দুল, আমুর, কেয়াকাটা, হেঁতাল, টাইগার ফার্ন, কালি লতা ও গোলপাতা ইত্যাদি।



ছবি - ৫: বিশ্বখ্যাত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

১.২.৪-গ্রামীণ বন

উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ গ্রামীণ বনে রয়েছে প্রায় ২০০ প্রজাতির বৃক্ষ। তাছাড়াও এ বনে উৎপাদিত হয় নানা শাক-সবজি, মসলা, ভেষজ উদ্ভিদ, বাঁশ ও বেত। গ্রাম-গঞ্জের প্রধান গাছ হচ্ছে আম, কাঠাল, জাম, বাঁশ, খেজুর, পেয়ারা, সুপারী, নারিকেল ইত্যাদি। এছাড়া তাল, জিওলভাদী, পিটালী, বরঞ, হিজল, গাব, সাজিনা, শিরিষ, শীল কড়ই, রেঞ্জিকড়ই, মান্দার, সোনালু, মিনজিরি, চিকরাশি, শিমুল, ছাতিম, বাবুল, লিচু, আমড়া, চালতা, তেঁতুল, শিশু, দেবদারু, কৃঞ্চচূড়া, রাধাচূড়া, কামিনী, বকফুল, মেহগিনি, কদম, বট, অশথ, জগ্য ডুমুর, অর্জুন, আমলকী, কামরাঙ্গা, বাজনা, বকুল, কাঞ্চন, পলাশ ইত্যাদি বৃক্ষ গ্রামীণ বনে পাওয়া যায় (ছবি - ৬)।



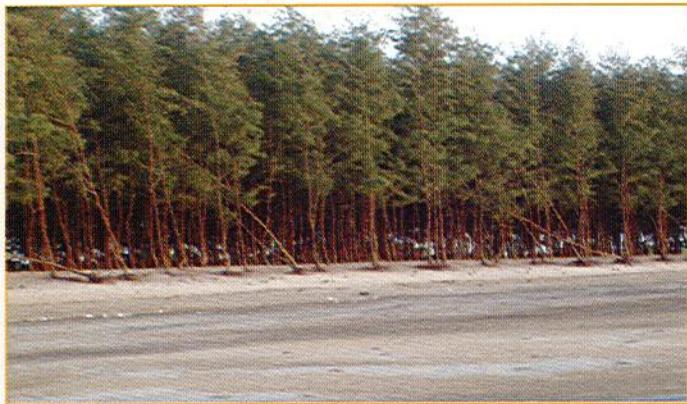
ছবি - ৬: জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ গ্রামীণ বন।

১.৩ কিছু বিশেষ ধরণের বন

উপরে বর্ণিত চার ধরনের বন ছাড়াও আমাদের দেশে ছোট আকারের বিশেষ ধরনের কিছু বন আছে যার মধ্যে রয়েছে সমুদ্র সৈকত বন, জলাভূমির বন ও উপকূলীয় বন।

১.৩.১ সমুদ্র সৈকত বন

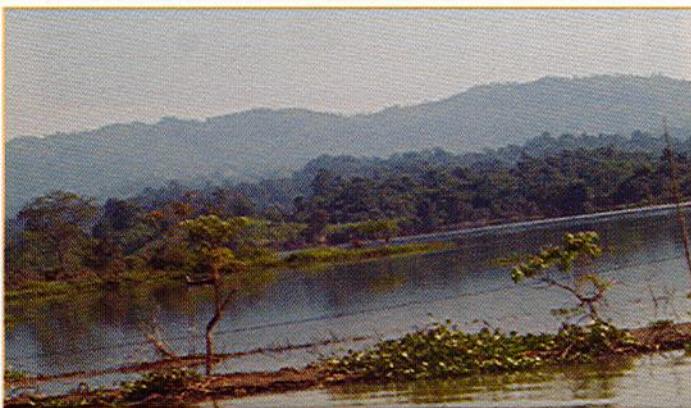
এ ধরনের বন কক্ষবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার সমুদ্র তীরবর্তী ভূমি ও সমুদ্রের মাঝে বালিময় উঁচু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় (ছবি-৭)। এ ধরনের বন একাধারে বিস্তৃত নয়। এ বনের প্রধান বৃক্ষ হচ্ছে ঝাউ, করমজা, পুনিয়াল, পালিতা মান্দার, পানিয়া মান্দার, পরশ, হিজল, নিশিন্দা ইত্যাদি। এছাড়া বিস্তীর্ণ খালি এলাকা লতা জাতীয় গাছ দ্বারা আবৃত থাকে। অন্যান্য গাছের মধ্যে ঢেল কলমি, হারগোজা, কেয়াকাটা উল্লেখযোগ্য।



ছবি - ৭: কুতুবদিয়া দ্বীপের সমুদ্র সৈকতের ঝাউ বন।

১.৩.২ জলাভূমির বন

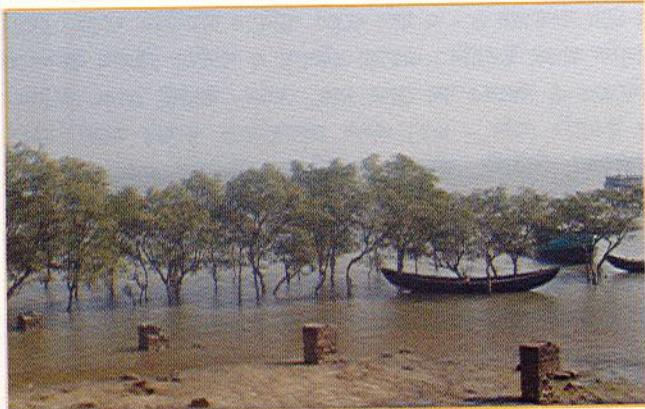
জলাভূমি বলতে দেশের বিল, হাওর, বাওর, মরা নদীর অংশ ও বড় বড় দিঘিকে বুঝায়। এ জাতীয় বনাঞ্চল বৃক্ষের সিলেট জেলার হাওর এলাকার নিম্নভূমিতে অবস্থিত, যেখানে ভূমি প্রায় বৎসরের ৬ - ৭ মাস ধরেই পানিতে নিমজ্জিত থাকে। যেমন, হাইল হাওর, হাকালুকি হাওর ইত্যাদি। এছাড়া চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বনাঞ্চলের মাঝে নীচু জলাভূমিতেও এ ধরনের বন দেখা যায়, যেমন- কাঙ্গাই লেক, কাটলি লেক ও মাইনি লেক ইত্যাদি (ছবি - ৮)। এসব জলাভূমিতে বৃক্ষের মধ্যে হিজল, বৱুণ, করমজা, হারগাজা, পিটালী, জারুল, পানিবিয়াস ইত্যাদি এবং গুল্য জাতীয় গাছ হিসেবে বেত, ল্যান্টানা, খাগড়া উল্লেখযোগ্য। ত্রিভূমির সাথে সহযোগী গাছ হিসেবে শীলকড়ই, মটর কড়ই, শিমুল, বহাল ইত্যাদি জন্মে। নদীর ধারে করমজা, কদম, তমাল, বিয়াস ইত্যাদি গাছ দেখা যায়।



ছবি - ৮: পার্বত্য চট্টগ্রাম বনাঞ্চলের মাঝে মাইনি লেক।

১.৩.৩ উপকূলীয় বন

সরকার ১৯৬৬ থেকে উপকূল এলাকায়, বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চলে উপকূলীয় বন সৃজনের চেষ্টা করছে। এ ধরনের বন উপকূলীয় এলাকার জনগণকে খড় ও জলচ্ছাস থেকে রক্ষা করে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল এবং পটুয়াখালী জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে বন বিভাগের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকূলীয় বন সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া কুতুবদিয়া, মহেশখালী, সোনাদিয়া, সন্দীপ, হাতিয়া, নিঝুমদীপ, মৌলভীর চর, রামগতি, চরজবার, চরলক্ষ্মী, মনপুরা এবং চর কুকরি মুকরিতেও বনায়ন কাজ চলছে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টের জমিতে উপকূলীয় বন সৃজন করা হয়েছে। দ্বীপাঞ্চল এবং উপকূলীয় বাঁধে মূলতঃ কেওড়া, গেওয়া, কাঁকড়া, বাইন, পশুর, গরাণ, বাবলা এবং খয়ের গাছ লাগানো হচ্ছে। উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্পে প্রায় ৯০% কেওড়া ও অবশিষ্ট ১০% অন্যান্য প্রজাতির গাছ (ছবি - ৯)। যে সমস্ত চরাঞ্চলে জোয়ার-ভাটার পানি পৌছেনা, সেখানে ক্রমান্বয়ে রেইনিং বা রেঙ্গিকড়ই, বাবলা, কড়ই ইত্যাদির বাগান সৃজন করা হয়ে থাকে।



ছবি - ৯: নাক মদীর তীরে উপকূলীয় বনাঞ্চল।

১.৪ বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ সংরক্ষণে করণীয়

আগেই বলা হয়েছে যে, জন সংখ্যা বৃদ্ধি, বনভূমি বেদখল হয়ে যাওয়া, অধিক হারে বৃক্ষনিধন এবং দ্রুতবর্ধনশীল আঘাতী বিদেশী প্রজাতির গাছ বনাঞ্চলসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চাষাবাদের কারণে আমাদের দেশীয় গাছপালাসমূহ অবহেলিত হয়েছে। ফলে দ্রুতবর্ধনশীল বিদেশী গাছ দেশীয় গাছের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ এবং প্রতিবেশের বিবেচনায় দ্রুতবর্ধনশীল বিদেশী প্রজাতির পাশাপাশি দেশীয় গাছপালার আবাদও রাখা প্রয়োজন। কিছু কিছু

প্রতিবেশে বিশেষ প্রজাতির বৃক্ষের আধিক্য থাকে। সে বৃক্ষপ্রজাতিকে ঘিরেই প্রতিবেশ তৈরি হয়। সেসব স্থানে বিদেশী গাছ যত দ্রুতবর্ধনশীল হউক না কেন, সে ধরনের গাছ লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে। সামগ্রিক এক জরীপে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে বেশ কিছু গাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে। আইইউসিএন এর রেড ডাটা বই বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় গাছের বিস্তারিত রেকর্ড করে থাকে। রেড ডাটা বইয়ে বিলুপ্তপ্রায় হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় ১০৬ টি বৃক্ষ স্থান পেয়েছে। এসব বৃক্ষকে প্রাক্তিক বনে ফিরিয়ে আনতে দু'ধরনের উদ্যোগ নেয়া যায়।

- বিপন্ন বা বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ চিহ্নিত বা সনাক্ত করে তার আবাসস্থলের সংস্কার ও পুনরুদ্ধারসহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ পদ্ধতিকে *In situ conservation* বলা হয়। এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম পদ্ধতি।
- আবাসস্থলের সংরক্ষণ ছাড়াও তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিপন্ন বৃক্ষের বীজ বা কাটিং দ্বারা চারা উৎপাদন করে সে সব বৃক্ষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ক্ষেত্রে চারা উৎপাদন করার পর মূল আবাস ভূমিসহ বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে বংশ বিস্তার করা যায়। এ ধরণের পদ্ধতিকে *Ex situ conservation* বলে।

বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উভয় পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় গাছ চিহ্নিতকরণ, বীজ সংগ্রহ করা, নার্সারিতে চারা উত্তোলন কৌশল নির্ধারণ করা এবং অবশ্যে জনগণকে উদ্বৃদ্ধ করে এসব দেশীয় গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেয়া। দ্রুতবর্ধনশীল বিদেশী গাছ থেকে দ্রুত কাঠ বা জ্বালানীকাঠ পাওয়া যায় বটে, তবে দীর্ঘ মেয়াদি লাভ নিশ্চিত করতে হলে দেশীয় প্রজাতির গাছের আবাদ বাঢ়াতে হবে। আরণ্যক ফাউণ্ডেশন সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারি মালিকদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় গাছের বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন ও পরিচর্যায় দক্ষতা সৃষ্টির কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বিগত বছরে এসব নার্সারি এ ধরনের প্রায় পাঁচ লক্ষ গাছের চারা উত্তোলন করে বাজারজাত করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণে আরণ্যক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে দেশের ক্ষয়িত্ব উৎসমঙ্গলীয় বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে আরণ্যক ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে উষ্ণমঙ্গলীয় বন সংরক্ষণ, বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষপ্রজাতি সংরক্ষণ এবং বন সংরক্ষণে জড়িত জনগোষ্ঠীর জীবন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা। বনায়নের জন্য বিপন্নপ্রায় বৃক্ষপ্রজাতি সমুহের চারা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বীজ সংগ্রহ, চারা উত্তোলন ও নার্সারি পদ্ধতি নিরূপণে আরণ্যক ফাউন্ডেশন ২০০৬ সালে ‘আরণ্যক ফাউন্ডেশন নার্সারি প্রকল্প’ শিরোনামের একটি প্রকল্প হাতে নেয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মবাজার, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, যশোর, নওগাঁ, রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার মোট ২৬ টি নার্সারি মালিকের বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি নির্বাচন ও চিহ্নিতকরণ, বীজ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, চারা উত্তোলন এবং পরিচর্যার ওপর দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রতিটি নার্সারি গড়ে প্রায় ২০,০০০ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির চারা উত্তোলন করে। প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী ২৬ টি নার্সারির মালিক, নার্সারির নাম ও ঠিকানা সারণী-২ এ সংযোজন করা হল।

সারণী-২: বিপন্নপ্রায় বৃক্ষপ্রজাতির নার্সারি উত্তোলন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী নার্সারি সমূহের নাম ও ঠিকানা।



জনাব মোঃ শাহজাহান
কর্মবাজার নার্সারি
নিউ সার্কিট হাউজ রোড
কর্মবাজার।



বাবু মুশ্রফ সেনগুপ্ত
ফাউন্ডেশন নার্সারি
নিউ সার্কিট হাউজ রোড
কর্মবাজার।



জনাব গোলাম আলী
কোর্ট হিল নার্সারি
কোর্ট হিল
কর্মবাজার।



জনাব মোঃ ফরিদুল আলম
মালক্ষ নাসারি
বৈরাগীরখিল, দুলহাজারা
চকরিয়া, কর্বুবাজার।



জনাব মোঃ আবদুস শুকুর
বনকুল নাসারি
মাইজপাড়া, দুলহাজারা
চকরিয়া, কর্বুবাজার।



জনাব মোঃ ফজলুরউদ্দিন
রোজ হেতেন বাগিচাহাট নাসারি
বাগিচাহাট
চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।



বারুল চন্দ্র ভোঁমিক
সুনী নাসারি
কলেজ রোড, বড়বাজার
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।



জনাব মোহাম্মদ আলী
পপি নাসারি
নেয়াজীপাড়া (টিএভিটি অফিসের নিকটে)
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।



জনাব মোঃ বিপ্লব
জননী নাসারি
১ নং রেলগেট, ভানুগাছ রোড
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার



জনাব মোঃ আরুল কাসেম
শার্মিন নাসারি
এফ-১৩৭/১, উত্তর ছায়াবীথি
জয়দেবপুর, গাজীপুর।



জনাব হুমায়ুন কবির
পাশা নাসারি
বাংলো-লক্ষ্মপুর সাহেবের বাড়ি
শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।



জনাব শেখ সাদী
বাসা নাসারি
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
শামস্তাপুর, গাজীপুর।



জনাব আমিনুর হোসেন
শহীদ নাসরি
নয়নপুর বাজার,
ত্রিপুরা, গাজীপুর।



বাবু সুরজন দেব নাথ
আসপাড়া নাসরি
ভালুকা
ময়মনসিংহ।



জনাব সবুজ মিয়া
দুই ভাই নাসরি
ভরাডোবা, ভালুকা
ময়মনসিংহ।



জনাব জয়নাল আবেদীন
জয়নাল নাসরি
ভরাডোবা বাজার
ভালুকা, ময়মনসিংহ।



জনাব মোঃ রুবল আমিন
হিটম্যান ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট
সোসাইটি নাসরি
নল্লিবাড়ী, মুকুগাছা, ময়মনসিংহ।



জনাব আশরাফুল ইসলাম (রহিম)
রহিম উদ্দিন নাসরি
জেলা সদর,
ঢাঙ্গাইল।



জনাব কিসমত আলী
ইসমত আরা নাসরি
সখিপুর
ঢাঙ্গাইল।



জনাব মোঃ এনায়ুল হক
মাষ্টার নাসরি, মখরমপুর
লখাইজানি, নওগাঁও সদর
নওগাঁও।



জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন
সিটি নাসরি
চকচাপাই, শেলগাছী
নওগাঁও।



জনাব মোঃ জাহানুর আলম
গুড়চাঁ নার্সারি
গোদাগাড়ী
রাজশাহী।



জনাব মোঃ আরিফ রেজা
সনি নার্সারি
দূর্গাপুর, চাপাই দূর্গাপুর
চাপাইনবাবগঞ্জ।



জনাব হাফিজুর রহমান
লিমন নার্সারি
সাতমাইল বারীনগর
বেনেয়ালী, যশোর।



জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন (বাবু)
হাজেরা নার্সারি
ভেট্টাকিয়া
যশোর।



জনাব বসির আহমদ
বনচাঁৰী নার্সারি
সাধনপুর, বাশখালী
চট্টগ্রাম।

২.২ বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতিসমূহের চারা উত্তোলনের জন্য প্রশিক্ষণ

বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতিসমূহের চারা উত্তোলন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকরী প্রতিটি নার্সারির দু'জন প্রতিনিধিকে তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধি করা হয়। প্রতিটি নার্সারি এক বছরে তাদের নির্ধারিত চারা উত্তোলন কর্মসূচির পাশাপাশি বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির ২০,০০০ চারা উত্তোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে বিপন্নপ্রায় প্রজাতি চিহ্নিত করবে, বীজ কিভাবে সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা হয় (ছবি ১০ - ১৫)।



ছবি ১০: আবণ্যক ফাউন্ডেশনের উদ্বোগে পরিচালিত ট্রেনিং প্রোগ্রাম, চট্টগ্রাম।



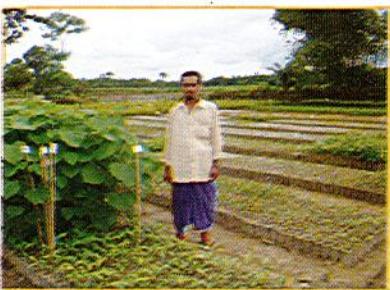
ছবি ১১: আবণ্যক ফাউন্ডেশনের উদ্বোগে পরিচালিত ট্রেনিং প্রোগ্রাম, ভালুকা, ময়মনসিংহ।



ছবি ১২: কর্বাজার নামারিতে উদ্বোলিত বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির চারা সমূহ।



ছবি ১৩: ফাউন্ডেশন নামারিতে উদ্বোলিত বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির চারা সমূহ।



ছবি ১৪: জয়নাল নামারি, ভৰাডোৱা বাজার
ভালুকায় উদ্বোলিত বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির চারা সমূহ।



ছবি ১৫: এলাকাভিত্তিক বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন।

২.৩ নাসাৰিতে উত্তোলিত প্ৰধান প্ৰধান বিপন্নপ্রায় প্ৰজাতিৰ চাৰাসমূহেৰ তালিকা
 সাৰণী - ৩: আৱণ্যক ফাউন্ডেশনেৰ সহায়তায় নাসাৰিতে উত্তোলিত প্ৰধান প্ৰধান
 চাৰাসমূহেৰ তালিকা :

নং	বাংলা নাম	Scientific name
০১	ৱক্তচন্দন	<i>Adenanthera pavonina</i>
০২	হলদ, কইকা	<i>Adina cordifolia</i>
০৩	শিল কড়ই	<i>Albizia procera</i>
০৪	ছাতিয়ান	<i>Alstonia scholaris</i>
০৫	বৈলাম	<i>Anisoptera scaphula</i>
০৬	কদম	<i>Anthocephalus chinensis</i>
০৭	এলেনা, ছুটকি, অ্যানোলিগোটা	<i>Antidesma acidum</i>
০৮	পিতোৱা, রয়না	<i>Aphanamixis polystachya</i>
০৯	পাতা করোলা, কেচুয়া,	<i>Aporusa dioica</i>
১০	আগৱ	<i>Aquilaria agallocha</i>
১১	চাপালিশ, চাষ্বল	<i>Artocarpus chama (A. chaplasha)</i>
১২	বৱতা, টেউয়া	<i>Artocarpus lacucha</i>
১৩	নিম	<i>Azadirachta indica</i>
১৪	হৱপাতা, লটকন	<i>Baccaurea ramiflora</i>
১৫	হিজল	<i>Barringtonia acutangula</i>
১৬	কাঞ্চন, ৱক্ত কাঞ্চন	<i>Bauhinia variegata</i>
১৭	কাইনজাল, লউবাদি	<i>Bischofia javanica</i>
১৮	শিমুল	<i>Bombax ceiba</i>
১৯	কাঠগোটা	<i>Bridelia pubescence</i>
২০	মুস	<i>Pterospermum acerifolium</i>
২১	পলাশ	<i>Butea monosperma</i>
২২	পুন্যাল, সুলতানা চম্পা	<i>Calophyllum inophyllum</i>
২৩	সোনালু, বান্দৱলাঠি	<i>Cassia fistula</i>
২৪	বন সোনালু	<i>Cassia nodosa</i>
২৫	বাটনা, শিল-বাটনা	<i>Castanopsis indica (Quercus indica)</i>
২৬	জাত বাটনা	<i>Castanopsis lancifolia</i>
২৭	বাটনা, কদু বাটনা	<i>Castanopsis tribuloides</i>
২৮	চিকৰাশি	<i>Chukrasia velutina</i>
২৯	তেজ বহল, কসতুৱি	<i>Cinnamomum cecidodaphne</i>
৩০	বহাল	<i>Cordia dichotoma</i>

নং	বাংলা নাম	Scientific name
৩১	বরংনা, লাড়ুম, পিতাঞ্জলা	<i>Crataeva magna</i>
৩২	চালতা, চালিতা	<i>Dillenia indica</i>
৩৩	হারগাজা, আজুলি	<i>Dillenia pentagyna</i>
৩৪	গাব, দেশী গাব	<i>Diospyros peregrina</i>
৩৫	ধলি-গর্জন, ডুলাইয়া-গর্জন	<i>Dipterocarpus alatus</i>
৩৬	বাইটা-গর্জন, শিল-গর্জন	<i>Dipterocarpus costatus</i>
৩৭	ধলি-গর্জন	<i>Dipterocarpus gracilis</i>
৩৮	তেলিগর্জন, কালিগর্জন	<i>Dipterocarpus turbinatus</i>
৩৯	বান্দরহোলা	<i>Duabanga grandiflora</i>
৪০	জলপাই, বেলপাই	<i>Elaeocarpus floribundus</i>
৪১	মাদার, পালিতা মাদার	<i>Erythrina variegata</i>
৪২	বট	<i>Ficus bengalensis</i>
৪৩	ঝিরি বট, পাকুর, পাইকার	<i>Ficus benjamina</i>
৪৪	জইগা-ডুমুর, বড় ডুমুর	<i>Ficus racemosa</i>
৪৫	অশ্বথ, পান বট	<i>Ficus religiosa</i>
৪৬	উদাল, উজাল, পাটা গুটা	<i>Firmiana colorata</i>
৪৭	বনখই, বৈচী	<i>Flacourtie indica</i>
৪৮	কাউ, কাউ-গুলা, কাউয়া	<i>Garcinia cowa</i>
৪৯	শিল-বাদি, কাপিলা	<i>Garuga pinnata</i>
৫০	কেচুয়া	<i>Glochidion lanceolarium</i>
৫১	গামার, জুগিনি চক্র	<i>Gmelina arborea</i>
৫২	কুরচ	<i>Holarrhena pubescence</i>
৫৩	তেলসুর	<i>Hopea odorata</i>
৫৪	চালমুগরা	<i>Hydnocarpus kurzii</i>
৫৫	সিদা জারংল, টিলা জারংল	<i>Lagerstroemia parviflora</i>
৫৬	জারংল	<i>Lagerstroemia speciosa</i>
৫৭	জিয়ল ভাদি, ঝিগা	<i>Lannea coromandelica</i>
৫৮	দুবা বাটনা, কাস্তা বাটনা	<i>Lithocarpus acuminata</i>
৫৯	কালি বাটনা, কালা বাটনা	<i>Lithocarpus fenestratus</i>
৬০	ধলি বাটনা, রাই-বাটনা	<i>Lithocarpus thomsonii</i>
৬১	খারা জুরা	<i>Litsea glutinosa</i>
৬২	মেদা, মেদা, বড় কুকুর-চিতা	<i>Litsea monopetala</i>
৬৩	রক্তন	<i>Lophopetalum fimbriatum</i>
৬৪	মহুয়া	<i>Madhuca indica</i>
৬৫	উরি আম	<i>Mangifera sylvatica</i>

নং	বাংলা নাম	Scientific name
৬৬	নাগেশ্বর	<i>Mesua nagassarium</i>
৬৭	চম্পা, চম্পাফুল	<i>Michelia champaca</i>
৬৮	আচার, পটকা	<i>Microcos paniculata</i>
৬৯	গাঙ্কি-গজারি, বুল-গজারি	<i>Miliusa velutina</i>
৭০	ডাকরুম, পুতিকদম	<i>Mitragyna parvifolia</i>
৭১	খুনা, কানাইডিঙ্গা	<i>Oroxylum indicum</i>
৭২	টালি, দুদি, লালি	<i>Palaquium polyanthum</i>
৭৩	থইয়া-বাবলা	<i>Pithecellobium dulce</i>
৭৪	বাঁশপাতা	<i>Podocarpus nerifolia</i>
৭৫	করঞ্জা, কেরং, করচ	<i>Pongamia pinnata</i>
৭৬	গুটগুইট্টা, নিউর, লুও-বাদি	<i>Protium serratum</i>
৭৭	কনক চম্পা, মুস, মুসিগঙ্গা	<i>Pterospermum acerifolium</i>
৭৮	বুদ্ধু নারিকেল, নারিকেলি	<i>Pterygota alata</i>
৭৯	অশোক	<i>Saraca asoca</i>
৮০	কুসুম, জয়না	<i>Schleichera oleosa</i>
৮১	ভেলা, পেরুলাগোটা	<i>Semecarpus anacardium</i>
৮২	শাল, গজারি	<i>Shorea robusta</i>
৮৩	ফাইশ্যা-উদাল, উদাল	<i>Sterculia villosa</i>
৮৪	ধারমারা	<i>Stereospermum personatum</i>
৮৫	শেউরা, হরবা	<i>Streblus asper</i>
৮৬	আম চুন্দল, সিভিট	<i>Swintonia floribunda</i>
৮৭	জাম, কাল-জাম	<i>Syzygium cumini</i>
৮৮	পুতিজাম, বন-জাম, নলি-জাম	<i>Syzygium fruticosum</i>
৮৯	চাকি-জাম	<i>Syzygium grandis</i>
৯০	তেত্তুল	<i>Tamarindus indica</i>
৯১	অর্জুন	<i>Terminalia arjuna</i>
৯২	বহেরা	<i>Terminalia bellirica</i>
৯৩	হরিতকি	<i>Terminalia chebula</i>
৯৪	চন্দুল	<i>Tetrameles nudiflora.</i>
৯৫	পারাস	<i>Thespesia populnea</i>
৯৬	তুন, সুরঞ্জবেদ, রঙ্গি	<i>Toona ciliata</i>
৯৭	পিটালি, গুটাগামার, পিতাগুলা	<i>Trewia nudiflora</i>
৯৮	আরশল, হরিনা, গোদা	<i>Vitex glabrata</i>
৯৯	নিশিন্দা	<i>Vitex negundo</i>
১০০	আরশল	<i>Vitex peduncularis</i>
১০১	দুধ-কুরচ, শ্বেত-কুরচি	<i>Wrightia arborea</i>
১০২	হানসাক, অংসাক	<i>Xanthophyllum flavescens</i>
১০৩	বাজনা	<i>Zanthoxylum rhetsa</i>
১০৪	বন-বরই, আনিঙ্গোটা	<i>Ziziphus rugosa</i>

ত্বরীয় অধ্যায়

৩.১ বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি সমূহের নার্সারির ধরন ও পরিকল্পনা

বৃক্ষ প্রজাতির প্রজনন সাধারণত: বীজের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে হয়। কিছু কিছু প্রজাতির অঙ্গ পদ্ধতিতেও প্রজনন সম্ভব। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছে ফুল, ফল ও বীজ হয়। বীজ মাটিতে পড়ে চারা হয়। কিন্তু বনাঞ্চলে নানা ধরনের গাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে সব চারা টিকে থাকতে পারে না। তাছাড়া, কিছু কিছু বীজ থেকে চারা উত্তোলন করতে বেশ কিছু পরিচর্যার জন্য নার্সারির প্রয়োজন হয়। কোন বিশেষ প্রজাতির অধিক সংখ্যক চারা প্রয়োজন হলে নার্সারিতে চারা উত্তোলন করতে হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে নির্দিষ্ট প্রজাতির গাছের চারা সে গাছের নিচেও পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা সংগ্রহ করেও নার্সারিতে পরিচর্যা করা যায়।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১০ হাজারেরও বেশি নার্সারি রয়েছে যেখানে ফুল, ফল, কাঠ জাতীয় গাছ ও ভেষজ উদ্দিদের চারা পাওয়া যায়। এসব নার্সারির সাইজ কয়েক শতক থেকে একশ বিঘার ও প্রতি রয়েছে। বগুড়ার সাথী নার্সারির সাইজ ১১০ বিঘা যেখানে প্রায় ৫০০ প্রজাতির গাছের চারা পাওয়া যায়।

আয়তন ভিত্তি নার্সারি: জায়গার আয়তনের উপর ভিত্তি করে নার্সারিকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়, যেমন:

- **ছোট নার্সারি:** ৩ - ৫ শতাংশ জমি বা প্রায় ৫,০০০ টি চারা উত্তোলন, পরিচর্যা ও বিতরণের ব্যবস্থা সম্পন্ন নার্সারি ছোট নার্সারি হিসাবে পরিচিত। তবে গ্রাম এলাকায় অনেকে আরও স্বল্প পরিসরে উঠানে বা বাড়ির আঙিনায় আরো কম সংখ্যক চারা উত্তোলন করে থাকে।
- **মাঝারি নার্সারি:** ৫ - ১০ শতাংশ ভূমি বা প্রায় ২৫,০০০ টি চারা উত্তোলন, পরিচর্যা ও বিতরণের ব্যবস্থা সম্পন্ন নার্সারি মাঝারি নার্সারি হিসাবে পরিচিত।
- **বড় নার্সারি:** ১০ শতাংশের বেশি ভূমি বা ৫০,০০০ টির বেশি চারা উত্তোলন, পরিচর্যা ও বিতরণের ব্যবস্থাসম্পন্ন নার্সারি বড় নার্সারি হিসাবে পরিচিত।

৩.২ নার্সারি স্থাপনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম বা ধাপসমূহ

একটি আদর্শ বৃক্ষ নার্সারি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ধাপে ধাপে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- নার্সারির জায়গা নির্বাচন, জায়গার পরিমাণ নির্ণয় ও জমি প্রস্তুতকরণ।
- নার্সারির বেড়া নির্মাণ ও পানির উৎস (কুপ বা টিউবওয়েল) তৈরি করা।
- চারা উত্তোলনের জন্য বেড়ে, পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা ও অভ্যন্তরীণ চলাচলের রাস্তা তৈরি করা।
- মাটি, বালি, গোবর, জৈব সার, পট বা ব্যাগ, যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক উপকরণসমূহ সংগ্রহ করা।
- নার্সারিতে চারা উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা।

৩.২.১ নাসারির জায়গা নির্বাচন, জায়গার পরিমাণ নির্ণয় ও প্রস্তুতকরণ

নাসারির জায়গা নির্বাচন

নাসারি স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নাসারির বাণিজ্যিক সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে সঠিক স্থান নির্বাচনের ওপর। তাই, সফল নাসারির জায়গা নির্বাচনের জন্য নিচের বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে:

- নাসারির জন্য নির্বাচিত জমি উচু, সমতল ও বর্ষাকালে বন্যামুক্ত হতে হবে।
- নাসারির জমিতে যথেষ্ট আলো বাতাস পেতে হবে। যদি আশেপাশে বড় গাছ থাকে এবং ঐ গাছ হতে নিচে ছায়া পড়ে, তবে সে গাছের ডালপালা ছেটে যতটুকু সম্ভব নাসারির স্থানকে ছায়ামুক্ত করতে হবে।
- নাসারির জন্য নির্বাচিত জমি উচু, সমতল ও বর্ষাকালে বন্যামুক্ত হতে হবে।
- নাসারির জমি এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যাতে প্রয়োজনবোধে ভবিষ্যতে নাসারির সম্প্রসারণ করা যায়।
- মাটি দোআঁশ ও কাঁকড়মুক্ত হতে হবে এবং মাটি সহজ প্রাপ্য হতে হবে।
- নাসারির প্রবেশ পথ ও অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য প্রশস্ত রাস্তা তৈরির সুযোগ থাকতে হবে।
- নাসারির স্থান হাট-বাজার, রাস্তা ও জল পথের নিকটবর্তী হলে প্রচার ও বাজারজাতকরণে সহজ হয়।

নাসারির জায়গার পরিমাণ নির্ণয়

নাসারিতে চারা উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি থাকা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করার পর চারা উত্তোলনের উপকরণ আছে কিন্তু চারা উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা উত্তোলন করা সম্ভব হয় না। সাধারণতঃ একটি নাসারির মোট জায়গার ৫০- ৬০% জায়গা চারা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাকি জায়গা নাসারির অভ্যন্তরীণ রাস্তা, নালা, পার্শ্বনালা, পলিব্যাগের মাটি তৈরি ও ব্যাগ ভর্তি, কম্পোস্টের গর্ত, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও বিশ্রামের জন্য ঘর তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাসারির জায়গার পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার

- মোট কত চারা উৎপাদন করা হবে?
- পট বা পলিব্যাগে এবং বেডে চারা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা,
- চারা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত পট বা পলিব্যাগের সাইজ ও সংখ্যা,
- নাসারিতে চারা সমূহ কতদিন পর্যন্ত রাখা হবে ইত্যাদি।

নার্সারির জায়গা প্রস্তুতকরণ

নির্ধারিত পরিমাণের ভিত্তিতে নার্সারির জায়গা নির্বাচনের পর জায়গাটিকে নার্সারি করার উপযোগী করতে হবে। যদি কোন ঝোপ জঙ্গল থাকে তা পরিষ্কার করে এবং উচু-নিচু থাকলে তা মাটি কেটে বা ভরাট করে সমতল করতে হবে। এমনভাবে সমতল করতে হবে যেন একদিক একটু ঢালু থাকে যাতে পানি নিষ্কাশন সহজ হয় এবং নার্সারিতে কোন পানি জমতে না পারে। সাধারণত: ১ - ২% ঢালু ভূমিতে সহজে পানি নিষ্কাশিত হয়।

জমি নির্বাচনের পর নার্সারির কোথায় নার্সারি বেড করা হবে, কোথায় শেড করা হবে, কোথায় নালা হবে, কোথায় কম্পোস্ট তৈরির গর্ত হবে, কোথায় মাটির স্তুপ হবে, কোথায় জলাধার হবে, কোথায় পলিব্যাগের মাটি প্রস্তুত ও পলিব্যাগ ভর্তি করার জায়গা হবে তা ঠিক করতে হবে। সুপরিকল্পিত নার্সারি যেমন সুদৃশ্য হয় তেমনি ব্যবস্থাপনাও সহজ হয়। ফলে রোগ প্রতিরোধ সহজ হয় এবং জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৩.২.২ নার্সারির বেড়া নির্মাণ

গর্জ-ছাগল ও হাস-মুরগি নার্সারির ভিত্তির প্রবেশ করে চারা বা রোপিত বীজ নষ্ট করতে পারে। তাই চারা রক্ষার জন্য নার্সারির চারদিকে বেড়া দেওয়া দরকার। সাধারণত: নার্সারিতে বাঁশের বেড়া ব্যবহার করা হয়। যদি বেড়ায় ব্যবহৃত বাঁশ রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা হয়, তবে বেড়া বেশ কয়েক বছর নষ্ট হয় না। এছাড়া কাঁটা মেহেদী, নিশিদ্বা, ঢোল কলমিসহ ছেট কাঁটা জাতীয় গাছ বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আজকাল নার্সারির চারপাশে নাইলন সুতার জাল বেড়া হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কাঁটা তারের বেড়া: কংক্রিটের পিলার, লোহার খুঁটি বা গাছের খুঁটি ব্যবহার করে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়। খরচের দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যবহৃত বিধায় গ্রামীণ পর্যায়ে পরিচালিত নার্সারিতে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে বন বিভাগ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এ ধরনের স্থায়ী বেড়া নির্মাণ করতে পারে।

৩.২.৩ চারা উত্তোলনের জন্য বেড, পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা ও অভ্যন্তরীণ চলাচলের পথ তৈরি

চারা উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন প্রকার বেড তৈরি করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া একই প্রজাতির চারার বিভিন্ন অবস্থায় একেক প্রকার বেডে স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়।

সমতল ভূমিতে নার্সারির বেডগুলি সাধারণতঃ পূর্ব - পশ্চিমে লম্বালম্বি হবে। এর ফলে বেডের চারাগুলি সমপরিমাণ সূর্যের আলো পাবে এবং সকল চারার বৃদ্ধি একই হারে হবে। সমতল ভূমিতে যে কোন প্রকারের একটি আদর্শ নার্সারির বেড সর্বোচ্চ ১.২ মি.

প্রস্ত ও ১২.২ মি. লম্বা হবে। নার্সারির জায়গার উপর ভিত্তি করে ও বেডের প্রস্তের দিক ঠিক রেখে বেডের দৈর্ঘ্য কম বা বেশী হতে পারে। নার্সারি বেডের প্রশস্ততা কম বেশী করা উচিত নয়। বেডের প্রশস্ততা ১.২ মিটারের বেশি হলে বেডের মাঝখানে অবস্থিত চারার পরিচর্যা করতে অসুবিধা হবে। ঠিক একইভাবে প্রশস্ততা কম হলে চারা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত জায়গার পরিমাণ কমে যাবে।

প্রতিটি নার্সারি বেড চারপাশ থেকে ১৫-২০ সে.মি. উঁচু হতে হবে। প্রতি দুই বেডের মাঝখানে ৩০-৬০ সে.মি. পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে যা পার্শ্বনালা হিসাবে কাজ করবে, আবার চারার পরিচর্যা ও চলাচলে সুবিধা হবে। প্রতি দুই বেডের মাঝখানে পার্শ্ব নালার মাটি বেডের উপর এমনভাবে হতে হবে যেন নার্সারি বেড পার্শ্ব নালা থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু হবে।

নার্সারিতে প্রধানত: নিম্নোক্ত বেডসমূহ তৈরি করা হয়ে থাকে

প্রাথমিক অঙ্কুরোদগম বেড

প্রজাতিভেদে বীজের অঙ্কুরোদগমের হার বিভিন্ন রকম হয়। যদি কোন বীজের অঙ্কুরোদগমের হার ৬০% এর নিচে হয়, তবে সেই সব বীজ সরাসরি পলিব্যাগে বা বেডে বপন না করে প্রাথমিক অঙ্কুরোদগম বেডে বপন করা ভাল। এছাড়া খুব ছোট বীজ পলিব্যাগে দেওয়ার চেয়ে প্রাথমিক অঙ্কুরোদগম বেডে দেওয়া উত্তম। প্রাথমিক অঙ্কুরোদগম বেডে বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়ার পর চারা ২ - ৫ সে. মি. লম্বা বা চার পাতা বিশিষ্ট হলে চারা ব্যাগ বা নগু শিকড় বেডে স্থানান্তর করতে হয়। প্রাইমারি বেডে সাধারণতঃ কদম, তুন, হলন্দ, ডাকুরুম ইত্যাদি বীজ বপন করতে হয়।

প্রাথমিক অঙ্কুরোদগম বেড তৈরির জন্য নির্ধারিত জায়গা ৩০ সে. মি. গভীর পর্যন্ত কুপিয়ে সেখান থেকে সব ঘাস ও আগাছা বেছে পরিষ্কার করতে হবে। পরে আরও ৩/৪ বার কুপিয়ে মাটিকে পুরো ঝুরুরে করতে হবে। মাটি থেকে নুড়ি, কাঁচ, ইটের টুকরা এবং অন্য সব আবর্জনা চালুনি করে সরিয়ে ফেলতে হবে। নার্সারির বেডের জন্য সংগৃহিত মাটি বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি হতে হবে। মাটির সঙ্গে থ্রয়োজন মাফিক বিয়োজিত পঁচা গোবর বা কম্পোস্ট ভালোভাবে মিশিয়ে বেডের মাটি প্রস্তত করতে হবে। গোবর/কম্পোস্ট মিশ্রিত মাটি সম্পূর্ণ বেডে সমান ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং কাঠির সাহায্যে মাটির উপরিভাগের লেভেল সমান করে দিতে হবে। বেডের উচ্চতা মাটির সমতল লেভেল থেকে ১৫-২০ সে. মি. উঁচু হওয়া উত্তম।

পট বা ব্যাগের চারা তৈরির বেড

পট বা ব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য একটি আদর্শ বেডের মাপ হবে লম্বায় ১২.২ মি. এবং প্রস্তে ১.২ মি। বেডের প্রশস্ততা ১.২ মিটারের কম বা বেশী করা উচিত নয়। পলিব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য মাটির উপরিভাগ ভালভাবে পিটিয়ে বা কোদাল দিয়ে কেটে মাটি সমান করতে হবে, যেন কোথায়ও অসমতল না থাকে। বেডের চারপাশের

তুলনায় মধ্যভাগ একটু উচু হলে বেডে পানি জমতে পারেনা। বেডের উপরিভাগের মাটি পিটিয়ে সমান ও শক্ত করতে হবে, যেন পলিব্যাগ বসালে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে এবং বৃষ্টির কারণে মাটি বসে না যায়। পলিব্যাগ যাতে গড়িয়ে বা হেলে না পড়ে, সেজন্য বেডের চারপাশে এজিং দিতে হবে। বেডের প্রশস্ততা ১.২ মিটারের কম করলে প্রতি বেডে চারার সংখ্যা কমে যাবে, আবার ১.২ মিটারের বেশী করলে বেডে পরিচর্যা, যেমন-আগাছা বাছাই, পানি সেচ, সার প্রয়োগ ইত্যাদি করা কষ্টকর হবে।

বেডের এজিং বা ঘেরা

পলিব্যাগ যাতে যথাযথ ভাবে খাড়া থাকে সেজন্য বেডের চারপাশ বাঁশের ফালির ঘেরা দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিতে হয় যা এজিং নামে পরিচিত। বেডের সীমানা বরাবর ৫০-৬০ সে.মি. দুরে দুরে খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে কাইম বা বাঁশের ফালি বেঁধে দিতে হবে (ছবি ১৬)। তাছাড়া ইট, কাঠের তক্তা বা সুপারির গাছের ফালি দিয়েও এজিং তৈরি করা যায়।



ছবি - ১৬: বাঁশের ফালির এজিং বা ঘেরা

পট বা ব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য মাটি প্রস্তুত করা

পট বা ব্যাগে ব্যবহারের জন্য যে মাটি ব্যবহৃত হবে তা তৈরির সময় বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই মাটি ভালভাবে শোধন করে, বিভিন্ন মৌল উপাদান নির্ধারিত হারে মেশানো দরকার। মাটিতে যদি খাদ্যোপাদান কম থাকে, পানি ও বায়ু চলাচল ঠিক মতো করতে না পারে, তবে চারা তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বাধ্যত হবে এবং কখনও সুস্থ সবল হয়ে বেড়ে উঠতে পারবেনা। পট বা ব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য দোঁআশ বা বেলে-দোঁআশ মাটি ব্যবহার করতে হবে।

কর্দমাক্ত এঁটেল মাটি চারা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কর্দমাক্ত এঁটেল মাটি শুকিয়ে চাপের সৃষ্টি করে শিকড়কে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দেয়না।

এতে চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং অনেক সময় মারাও যায়। মাটি জমির উপরের ১৫- ২০ সে.মি. স্তর থেকে সংগ্রহ করা ভাল। তাছাড়া ইট, কাঠের তক্কা বা সুপারি গাছের ফালি দিয়েও এজিং তৈরি করা যায়। ব্যাগে ভরার অন্তত ৪ সঙ্গাহ আগে মাটি সংগ্রহ করে নার্সারির নির্দিষ্ট স্থানে তা স্তৃপাকারে রাখতে হবে। মাটিতে যেন বেশি রোদ না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সংগৃহীত মাটির সঙ্গে শতকরা ২০- ২৫ ভাগ হারে গোবর সার এবং ২৫ ভাগ হারে পাতা পচা সার বা কম্পোস্ট সার এক সঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে চেলে নিলে তবে তা ব্যাগে ভরার উপযুক্ত হবে। শুকনো গোবর সার বা কম্পোস্ট সারও নির্দিষ্ট মাপের চালুনি দিয়ে চেলে নেওয়া দরকার। অনেক সময় গোবর সারের পরিবর্তে খৈল ও তুষের ছাই ইত্যাদির মিশ্রণ পলিব্যাগের মাটির সঙ্গে মিশানো যেতে পারে বা দোঁআশ মাটির সঙ্গে কম্পোস্ট মিশিয়ে ব্যাগের জন্য মাটি তৈরি করা যায়। এ কাজটি অবশ্যই পট বা পলিব্যাগ ভরার ১৫ - ২০ দিন আগে করতে হবে। ব্যাগে ভরার অন্তত ৪ সঙ্গাহ আগে মাটি সংগ্রহ করে নার্সারির নির্দিষ্ট স্থানে তা স্তৃপাকারে রাখতে হবে। মাটিতে যেন বেশি রোদ না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সংগৃহীত মাটির সঙ্গে শতকরা ২০- ২৫ ভাগ হারে গোবর সার এবং ২৫ ভাগ হারে পাতা পচা সার বা কম্পোস্ট সারও নির্দিষ্ট মাপের চালুনি দিয়ে চেলে নেওয়া দরকার। অনেক সময় গোবর সারের পরিবর্তে খৈল ও তুষের ছাই ইত্যাদির মিশ্রণ পলিব্যাগের মাটির সঙ্গে মিশানো যেতে পারে বা দোঁআশ মাটির সঙ্গে মাটি ও কম্পোস্ট ৩:১ হারে অর্থাৎ ৩ ভাগ মাটির সঙ্গে ১ ভাগ কম্পোস্ট মিশিয়ে ব্যাগের জন্য মাটি তৈরি করা যায়। এ কাজটি অবশ্যই পট বা পলিব্যাগ ভরার ১৫ - ২০ দিন আগে করতে হবে।

কোন কোন প্রজাতির চারা উত্তোলন করা হবে, তার উপর নির্ভর করে ব্যাগের সাইজ নির্ধারণ করা হয়। কারণ, কোন কোন প্রজাতির চারা অতি দ্রুত বাড়ে, যার ফলে ৩ - ৪ মাসের মধ্যেই চারা রোপণের উপযোগী হয়ে যায়, যেমন: কড়ই, ঘোড়া নিম, গামার ইত্যাদি। এই ধরনের চারা ১৫ সে.মি. × ১০ সে.মি. ব্যাগে উত্তোলন করতে হবে। আবার কোন কোন প্রজাতির চারা রোপণ উপযোগী হতে ১০ - ১২ মাস পর্যন্ত নার্সারিতে পরিচর্যা করতে হয়, যেমন: গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, শাল ইত্যাদি। এসব প্রজাতির চারা ২৫ সে.মি. × ১৫ সে.মি. ব্যাগে উত্তোলন করা যেতে পারে। ব্যাগে চারা পরিচর্যার সময়ে যে পানি দেওয়া হয়, তা যাতে পলিব্যাগে জমে না থাকে তার জন্য ব্যাগে মাটি ভরাটের আগেই ৪-৮ টি ছিদ্র করতে হবে।

৩.২.৪ প্রতি ব্যাগে মাটির পরিমাণ নির্ণয়

ব্যাগের জন্য মাটির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে সাধারণতঃ ৩:১ বা ৪:১ অনুপাতে মাটি ও গোবরের মিশ্রণ তৈরি করা হয়ে থাকে।

পলিব্যাগের সাইজ অনুসারে প্রতিটি ব্যাগের আয়তন

১৫ সে.মি. \times ১০ সে.মি. (৬ ইঞ্চি \times ৪ ইঞ্চি) = ৫০০ ঘন সে.মি. (৩০.৫ ঘন ইঞ্চি)

২৫ সে.মি. \times ১৫ সে.মি. (১০ ইঞ্চি \times ৬ ইঞ্চি) = ১৮৭৭ ঘন সে.মি. (১১৪ ঘন ইঞ্চি)

৪০ সে.মি. \times ২২ সে.মি. (১৬ ইঞ্চি \times ৯ ইঞ্চি) = ৪২১৬ ঘন সে.মি. (২৬০ ঘন ইঞ্চি)

পলিব্যাগের মাটির নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকতে হবে

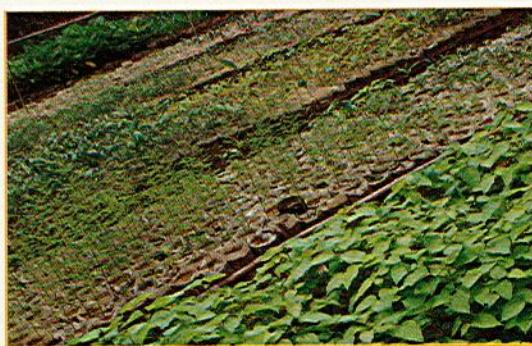
- মাটির পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা এবং বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকতে হবে।
- মাটিবাহিত পোকামাকড় ও রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবমুক্ত থাকতে হবে।
- মাটি উর্বর হতে হবে।
- গোবর ও মাটির মিশ্রণ হতে হবে ঝুরঝুরে, কোন অবস্থাতেই গোবরের ঢেলা রাখা যাবেনা।

ব্যাগে মাটি ভরাট করা

ব্যাগে মাটি ভরার আগে ব্যাগের গায়ে ৪-৬ টি ছোট ছোট ছিদ্র করে নিতে হবে। অন্যথায়, ব্যাগে পানি জমে থাকবে, ফলে চারার গোড়া পাঁচে চারা মারা যায়। ছিদ্রযুক্ত পলিব্যাগ বাম হাতে ধরে ডান হাতে আস্তে আস্তে ইতঃপূর্বে প্রস্ততকৃত মাটি ভরতে হবে। ব্যাগ ভরার সময় দুহাত দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে দুতিন বার ঝাঁকুনি দিতে হবে। তারপর পুনরায় মাটি দিয়ে ব্যাগটি কানায় কানায় ভরতি করতে হবে। ব্যাগে মাটি যথাযথভাবে ভরাট না করলে ব্যাগের উপরিভাগ খালি হয়ে পানি জমে থাকবে।

নার্সারি বেডে ব্যাগ সজ্জিতকরণ

ব্যাগে মাটি ভরার পর ব্যাগগুলোকে নার্সারি বেডে সাজাতে হবে। পলিব্যাগ নার্সারি বেডে সাজানোর আগে বেডের মাটি ভালভাবে দুরমুজ করে সমান করতে হবে। তারপর বেডের এক পার্শ্ব থেকে মাটি ভর্তি ব্যাগসমূহ সোজা করে সাজিয়ে রেখে পর্যায়ক্রমিকভাবে সম্পূর্ণ বেডে ব্যাগ সাজাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ব্যাগগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে সুন্দরভাবে লেগে থাকে এবং সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সঠিকভাবে পলিব্যাগ ভরতি ও সাজানো হলে নির্দিষ্ট আকারের বেডে সমানসংখ্যক পলিব্যাগ সাজানো যাবে এবং বেডগুলো দেখতে সুন্দর দেখা যাবে (ছবি - ১৭)।



ছবি ১৭: নার্সারি বেডে ব্যাগ সজ্জিতকরণ।

৩.২.৫ বড় চারা বা নগ্ন শিকড় চারা উত্তোলনের জন্য বেড প্রস্তুত করা

নার্সারিতে যে সব চারা বড় করার জন্য (১.৫ মিটারের উপর) ১২ মাস বা আরও বেশি সময় রাখতে হয়, সেসব চারা নগ্নশিকড় পদ্ধতিতে উত্তোলন করতে হয়। যেমন: আম, কাঁঠাল, জলপাই ইত্যাদি চারা এই পদ্ধতিতে উত্তোলন করা হয়। যেখানে বেড তৈরি করা হয় সেখানকার মাটি ভাল না হলে অন্য জায়গা থেকে ভাল মাটি সংগ্রহ করে নিতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় গোবর বা কম্পোস্ট সার মাটিতে উত্তমরূপে মিশিয়ে কয়েকদিন রেখে দিতে হবে। তারপর মাটি সমান করে নিতে হবে। মাটি ও সার ভালভাবে মিশে গেলে নির্দিষ্ট মাপে বেড তৈরি করতে হবে। সাধারণতঃ বেডের মাপ ১২.২ মি. \times ১.২ মি. হয়। তবে প্রয়োজন অনুসারে বেডের আকার লম্বায় ছোট করা যেতে পারে। বেডের এজিং এর জন্য মাটি ১০ সে.মি. উচু করে বেডের চারদিকে ইট দিয়ে ঘের দিতে হবে বা খুঁটি পুঁতে তাতে লম্বা বাঁশের তরজা বেঁধে দিতে হবে যেন বেডের মাটি সরে না যায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি বেডের মাঝখানে পানি নিষ্কাশন ও চলাচলের সুবিধার জন্য ৫০-৬০ সে.মি. জায়গা ফাঁকা রাখতে হয়। এই পদ্ধতিতে চারা উত্তোলনের জন্য বীজ অথবা প্রাথমিক অঙ্কুরোদগম বেড থেকে ছোট চারা উঠিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে লাগাতে হবে এবং চারা বড় হলে মাটিসহ উঠিয়ে বিক্রি করা যায়। তবে চারার গোড়ার মাটি যাতে পড়ে না যায়, সেজন্য ধানের নাড়া বা পাতা ও দড়ি দিয়ে মাটিকে পেঁচিয়ে দিতে হয়।

৩.২.৬ পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা

নার্সারিতে পরিকল্পিত নালা ও পার্শ্বনালা থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি নার্সারিতে একটি প্রধান নালা থাকবে যার মুখ ঢালু দিকে খোলা থাকবে। সে নালার সঙ্গে পার্শ্বনালাগুলি যুক্ত করে দিতে হবে। প্রধান নালা দিয়ে নার্সারির পানি বাইরে চলে যাবে। প্রধান নালা ন্যূনতম ৩০-৫০ সে.মি. প্রস্ত ও ১৫-৩০ সে.মি. গভীর এবং পার্শ্বনালা ৩০ সে.মি. প্রস্ত ও ১৫ সে.মি. গভীর হবে। সব সময়ই নার্সারি এবং পার্শ্বনালাকে আগাছা ও আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে। নার্সারিতে পানি জমলে বা বেড স্যাঁতস্যাঁতে থাকলে চারার গোড়া পচে যায়, ফলে চারা মরে যায়।

আভ্যন্তরীণ চলাচলের পথ

বিভিন্ন খনকের মধ্যে সুবিধামত প্রধান যাতায়াত পথ ও পার্শ্ব পথ রাখতে হবে। পার্শ্ব যাতায়াত পথ নার্সারির চারা উত্তোলনে বিভিন্ন সামগ্রী ও চারা পরিবহণ করতে সহায়তা করে।

৩.২.৭ মাটি, বালি, গোবর, জৈব সার, পট বা ব্যাগ, যন্ত্রপাতি এবং আনুসাঙ্গিক

উপকরণ সংগ্রহ

নার্সারির মাটি ভাল হলে চারার দৈহিক গুণগত মান ভাল হয়। চারা সতেজ, সজীব এবং সরলভাবে বৃদ্ধি পায়। সেজন্য প্রয়োজন নার্সারির বেডের জন্য জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি সংগ্রহ করা। সাধারণতঃ বনাঞ্চলের যে কোন স্থানের উপরিভাগের মাটি (top soil) সংগ্রহ করা যায়। কারণ, গাছের পাতা ইত্যাদি পচনের ফলে বনাঞ্চলে ভূ-উপরিভাগের মাটির উর্বরতা বেশি থাকে। এ মাটিতে পানি নিষ্কাশন ও বাতাস চলাচলের ক্ষমতা বেশি থাকে। কাজেই, বনাঞ্চলের ১৫-২০ সে.মি. গভীর পর্যন্ত মাটি সংগ্রহ করা উত্তম।

বনের মাটি পাওয়া না গেলে যেখানে গাছপালা, ঝোপঝাড় আছে সেখানকার ভূত্পরিভাগ থেকে মাটি সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া কৃষিজমি বা নদীর পাড়ের উপরিভাগের পলিমাটি সংগ্রহ করা যেতে পারে। খাল, বিল, পুরুর ইত্যাদির মাটিও উত্তম। গ্রামের যেসব জমি বা জায়গা বেশিদিন অনাবাদী রয়েছে সেসব জায়গা থেকেও মাটি সংগ্রহ করা যেতে পারে। চারা উত্তোলনের জন্য যে গোবর ব্যবহার করা হবে তা অবশ্যই পচ্চা (decomposed) হতে হবে। কোন অবস্থাতেই কাঁচ গোবর ব্যবহার করা যাবে না। তাছাড়া ময়লা আবর্জনা মুক্ত গোবর ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিটি স্থায়ী নার্সারিতে কম্পোস্ট সার তৈরির জন্য নির্ধারিত জায়গা সংরক্ষণ করা অবশ্যিক। নার্সারি থেকে প্রতিদিন আগাছা, লতাপাতা, ডালপালা ইত্যাদি যদি নিয়মিতভাবে গর্তে ফেলা হয় এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রচুর পরিমাণে কম্পোস্ট সার পাওয়া যাবে এবং তা নার্সারিতে ব্যবহার করা যাবে।

আধুনিক নার্সারিতে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। নার্সারির আকার ও কাজ অনুসুরে যন্ত্রপাতি ভিন্ন ভিন্ন হবে। নার্সারিতে প্রধান কাজ হচ্ছে বীজতলা তৈরি, ব্যাগ বা প্লাস্টিক ব্যাগে চারা উত্তোলন, মাটি ভরাট, ড্রেন তৈরি, কলম তৈরি, বীজ বপন, সার প্রয়োগ, সেচ, শেড প্রয়োগ, আগাছা বাছাই, চারা স্থানান্তর করা, কম্পোষ্ট তৈরি, রোগবালাই দমন, চারা বেড থেকে মাটি সহ তোলা ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি। নার্সারিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অধিকাংশ কৃষিকাজেও ব্যবহৃত হয় এবং গ্রামের বিভিন্ন কৃষক পরিবারে পাওয়া যায়। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে কোদাল, দা, শাবল, খন্তি, ঝরনা, বালতি, চালনি, খুরপি, নিড়ানি, বেলচা, ছুরি, শিকেচার, করাত, হাতুড়ি, মুণ্ডু, এজিং নাইফ ও হেজিসিয়ার, রাবার বা প্লাস্টিক পাইপ, পাল্লা ও টেপ ইত্যাদি।

৩.২.৮ নার্সারিতে চারা উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা

একটি নার্সারি স্থাপন ও চারা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার আগে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। নার্সারি ব্যবসা শুরু করা বা চালু নার্সারিতে বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির চারা উৎপাদনের জন্য যে সকল দিক বিবেচনা করতে হয়, তা হল:

- বাজারের চাহিদা ও সুযোগ সুবিধার খোজখবর সংগ্রহ।
- নৃতন প্রজাতির চারা উত্তোলনের সম্ভাবনা যাচাই।
- বিলুপ্তপ্রায় চারা লাগানোর সম্ভাব্য স্থান ও জনগণের আগ্রহ জানা।
- চারা বা কলম কম খরচে উৎপাদনের কৌশল।
- লাভজনক সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ।
- উৎপাদিত চারা, কলম ইত্যাদি দক্ষতার সঙ্গে বিপণন কৌশল।

চতুর্থ অধ্যায়

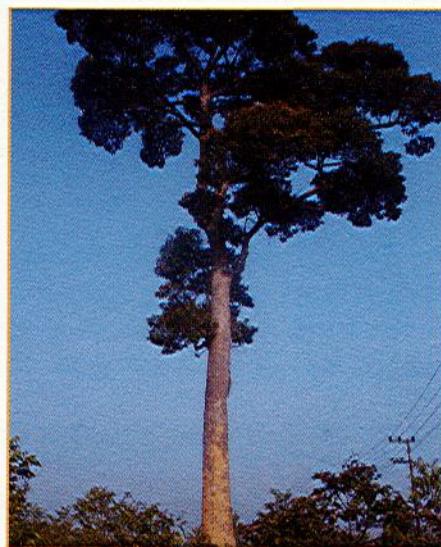
৪.১ বীজ সংগ্রহ, নিষ্কাশন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন ও সংরক্ষণ

৪.১.১ ভাল বীজ সংগ্রহের গুরুত্ব

ভাল বীজ মানে সুস্থ সবল চারার নিশ্চয়তা। আর ভাল চারা মানেই ভাল গাছ এবং অধিক উৎপাদন। সোজা ও গোলাকার কাণ্ড বিশিষ্ট বা উন্নত গাছের বীজ থেকে সাধারণত: উন্নত গাছের জন্য হয়। তাই ভাল গাছ পেতে হলে চারা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বীজের উৎস গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বীজের সার্বিক গুণাবলীরই প্রতিফলন ঘটবে নার্সারিতে উত্তোলিত চারার মধ্যে। সঠিক মা-গাছ থেকে ভাল বীজ সংগ্রহ করতে হবে। ভাল মা-গাছ এবং বীজের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

৪.১.২ ভাল মা গাছের বৈশিষ্ট্য

- কাণ্ড সোজা ও গোলাকার হবে।
- মা গাছ সুস্থ বা নিরোগ ও উচ্চ আকৃতি সম্পন্ন হবে।
- গাছের প্রধান কাণ্ড বিস্তৃত ঢালপালা মুক্ত থাকবে।
- গাছের শাখা প্রশাখা সবল ও সতেজ হবে।
- গাছের শীর্ষমুকুট চাঁদোয়া বা পল্লবগুচ্ছের (Crown coverage) বিস্তৃতি পরিমিতি হবে।
- মা গাছটি মাঝারি বয়সের অর্থাৎ পরিণত ফলদানকারী হতে হবে (কমপক্ষে ৪-৫ বছর ধরে ফল ধারণকারী হওয়া উত্তম)।
- ফলদ গাছের ক্ষেত্রে বীজ বা কলম পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনের জন্য ফলের আকার বড় ও স্বাদ মিষ্টি হতে হবে; যেমন-জলপাই, বাতাবি লেবু ইত্যাদি।



ছবি - ১৮: গর্জনের একটি আদর্শ মা বৃক্ষ।

ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য

- উন্নত মাত্বক্ষ হতে সংগৃহীত বীজ,
- বীজ পরিপক্ষ, পুষ্ট ও শক্ত,
- নীরোগ ও অবাধিত দাগ বিহীন হয়,
- বীজ আকারে বড় ও সুসম হয়ে থাকে,
- উচ্চ অঙ্কুরোদগম (80% বা তার চেয়ে বেশি) ক্ষমতাসম্পন্ন হয়,
- বীজের রঙ উজ্জল হয় এবং ধূলাবালিমুক্ত থাকে।

৪.১.৩ বীজ সংগ্রহের সময় বিবেচ্য বিষয়

বীজের সার্বিক গুণাবলীর উপর যেহেতু পরবর্তী প্রজন্ম নির্ভরশীল, তাই ভাল বীজ সংগ্রহ নিশ্চিত করার জন্য বীজ সংগ্রহের ব্যাপারে অনেক বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।
বীজ সংগ্রহে যে বিষয়গুলির প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন তা হলো:

ফল নির্বাচন ও সংগ্রহের সময়

- গাছের অধিকাংশ ফল পরিপক্ষ হলে তখনই বীজ সংগ্রহ করা উচিত।
- অপরিপক্ষ কিংবা অধিক পরিপক্ষ ফল এবং আগাম ফুল থেকে সৃষ্ট ফল বর্জন করা উচিত।
- শুকনা ফলের ক্ষেত্রে, যেমন কাঠ উৎপাদনকারী গাছের বেলায় ফল খুলে বা ফেটে যাবার আগেই বীজ সংগ্রহ করা উচিত।
- অপুষ্ট, বিকৃত অথবা পোকামাকড় রোগাত্মক ফল পরিহার করা উচিত।
- শুধুমাত্র স্বাভাবিক এবং মাঝের আকারের ফল বীজের জন্য সংগ্রহ করা উচিত।

ফল বা বীজের পরিপক্ষতা যাচাই

- পরিপক্ষ বীজ সাধারণত: শক্ত হবে।
- কাঠ উৎপাদনকারী গাছের ফল সাধারণত: শুক্ষ হয়।
- পাকা অবস্থায় মাংসল ফল নরম হয়, তবে গর্জন, শাল, বৈলাম ইত্যাদি ফলে অধিক আর্দ্রতা থাকে।
- সব সময় পরিপক্ষ বীজ সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ষ বীজের অঙ্কুরোদগমের হার কম। অনেক সময় অঙ্কুরোদগম হলেও পরে উৎপাদিত চারা মারা যায়।
- কিছু বীজ যেমন-আগর বীজ ফলসহ সংগ্রহ করে রোপণের আগে বীজ ফল থেকে বের করে রোপণ করতে হবে।

বীজ সংগ্রহ

- বীজ সংগ্রহের জন্য স্থানীয়ভাবে জন্মানো গাছ নির্বাচন করতে হবে। কারণ সেই গাছের স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা অধিক।
- উচ্চতা, আকৃতি, কাণ্ডের বেড়, রোগমুক্ত, শীর্ষমুকুট বা পত্রের গুচ্ছের আকৃতি (Crown coverage) প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করেই গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- একটিমাত্র মা গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ না করে $5-10$ টি মা গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা উত্তম।
- বীজ সংগ্রহের পর বীজগুলি ভালভাবে মিশ্রণ করে সে বীজ থেকে চারা উত্পন্ন করা উচিত।

ফল বা বীজ সংগ্রহের উপযোগী আবহাওয়া এবং সময়

- রৌদ্রোঁজ্জল দিনের মধ্য সকাল বা মধ্য বিকালে বীজ সংগ্রহ করা উচিত।
- কুয়াশা এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় বীজ সংগ্রহ করলে তা রোগ আক্রমণের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। দিনের মধ্যভাগে বীজ সংগ্রহ করলে তেমন ঘটনা।
- বৎসরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গাছের ফল পাকে। যখন ফল পাকে তখনই বীজ সংগ্রহ করতে হয়। যথাসময়ে বীজ সংগ্রহ করা না হলে পরে বীজ পাওয়া দুর্কর হয়। কাজেই ফল পাকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

বীজের চাহিদা বা পরিমাণ নির্ণয়

কত চারা উৎপাদন করা হবে তার ওপর ভিত্তি করে বীজের চাহিদা বা পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার জানা থাকলে তার ১০- ১৫% বেশি চারার হিসেব করে বীজের পরিমাণ নির্ণয় করে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করার সময়ে বীজের পাত্রের গায়ে বীজের নাম, সংগ্রহের তারিখ, সংগ্রহের স্থান প্রভৃতি অবশ্যই লিখে রাখতে হবে। যদি সম্ভব হয় বা জানা থাকে তবে বীজের অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার লিখে রাখা উচিত।

৪.১.৪ বীজ সংগ্রহের উৎস সমূহ

চারা উৎসের জন্য সাধারণতঃ দুটি উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

স্থানীয় উৎস: স্থানীয় উৎস থেকে উন্নত বীজ সংগ্রহ করাই শ্রেয়। কারণ, এই বীজ থেকে উৎপন্ন চারার পরিবেশ অভিযোজ্যতা অনেক বেশী হয়ে থাকে এবং মা গাছকে যাচাই করার সুযোগ থাকে।

বাংলাদেশে বীজ সংগ্রহের বিভিন্ন স্থানীয় উৎসগুলি হল

- প্রাকৃতিক বন।
- বন বিভাগ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক সৃজিত বন।
- সড়ক বনায়নের গাছপালা, বসতবাড়ি।
- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট এর বীজ বাগান।

বিদেশী উৎস: স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন বীজ পাওয়া না গেলে বিদেশি উৎস থেকে প্রত্যায়িত বীজ আমদানীর মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে, তবে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যেন ভবিষ্যতে এসব প্রজাতি আমাদের দেশীয় গাছ পালার উপর বিরুদ্ধ প্রভাব না ফেলে।

স্থানীয় উৎস থেকে ফল বা বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বাজার থেকে বীজ সংগ্রহ করা।
- ভূমি বা গাছের তলা থেকে বীজ সংগ্রহ করা।
- গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে ফলের বীজ সংগ্রহ করা।

স্থানীয় বাজার বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে বীজ সংগ্রহ

বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে গাছ লাগানোর প্রবণতা বেড়েছে। তাই বীজের চাহিদাও বেড়েছে। আজকাল অনেক দোকানে বীজ পাওয়া যায়। তারা স্থানীয়ভাবে বীজ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে থাকেন। এ সব বীজ এর ক্ষেত্রে বীজের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত

ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ, উৎস ভাল না হওয়ার কারণে বা বীজ পুরাতন হলে, সেই বীজ থেকে উৎপাদিত চারা ভাল হয় না। যদি বীজ এর উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না যায় সে বীজ ক্রয় না করাই ভাল। সেক্ষেত্রে নার্সারি মালিকেরা নিজেরা মাগাছ নির্বাচন করে সে গাছের বীজ সংগ্রহ করে চারা উৎপন্ন করতে পারেন। অন্যথায় বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনসিটিউট থেকে উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

ভূমি বা গাছের তলা থেকে বীজ সংগ্রহ

গাছের তলা থেকে বীজ সংগ্রহ করা একটি সহজ পদ্ধতি। পরিপক্ষ হলে অনেক বীজ মাটিতে পড়ে। এই পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহ করতে হলে গাছতলা ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে যাতে বীজ ময়লা আবর্জনার সঙ্গে মিশে না যায়। যেসব গাছের বীজ এই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায় সেগুলি হল গর্জন, ঢাকি জাম, সিভিট, শাল, তেলসুর প্রভৃতি।

গাছ থেকে ফল সংগ্রহ: গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে সে ফল থেকে বীজ নিষ্কাশনের মাধ্যমে যে বীজ পাওয়া যায়, সে বীজ অন্য যে কোন উপায়ে সংগৃহীত বীজ থেকে ভাল হয়। যে তিনটি পদ্ধতিতে গাছ থেকে সরাসরি ফল সংগ্রহ করা যায়, তা হলো:

সরাসরি গাছে উঠে: এ পদ্ধতিতে সরাসরি গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়। ফল পরিপক্ষ হলে গাছে উঠে দা বা ছুরি দিয়ে ফল সহ গাছের ছোট ছোট ডাল কেটে ফল সংগ্রহ করতে হবে। এতে ফল আঘাতপ্রাণ হয় না এবং অধিকাংশ বীজ ব্যবহার করা যায়। যেমন: করই, হলদু, হিজল ইত্যাদি।

মই ব্যবহার করে: যেসব গাছের বীজ ছোট এবং বীজ পড, ক্যাপসুল বা কোবের মধ্যে থাকে এবং মাটিতে পড়লে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় এবং মাটি থেকে সরাসরি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় সেই সমস্ত গাছের বীজ এই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়। যেমন- পড জাতীয় ফল, বাবলা, কড়ই, শিমুল, চম্পা ইত্যাদি।

লম্বা লাঠি ব্যবহার করে: অনেক গাছ এমন আছে যাতে আরোহণ করে বীজ সংগ্রহ করতে গেলে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে লম্বা লাঠির অগ্রভাগে ধারালো কোন কিছু বেঁধে তার সাহায্যে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। এতে গাছে বীজ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। যেসব গাছের ফল মাটিতে পড়লে ফেটে যায় না এবং বীজ ছড়িয়ে যায় না, সেসব গাছের বীজ এই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়। যথা- গর্জন, ঢাকি জাম, শাল, চাপালিশ, কদম, তেলসুর, পিতরাজ ইত্যাদি।

৪.১.৫ কিছু বিপন্ন প্রায় বৃক্ষপ্রজাতির বীজ সংগ্রহের সময়, অঙ্কুরোদগমকাল, প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা এবং অঙ্কুরোদগমের হার দেয়া হল (সারণী - ৪ ও সারণী - ৫)

সারণী - ৪: বাংলাদেশের কিছু বিপন্ন প্রজাতির গাছের বীজ আহরণকাল ও প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা

নং	প্রজাতির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা
১.	খয়ের-Acacia catechu	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	২০,০০০-২২,০০০
২.	হলদু, কাইকা-Adina cordifolia	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	১২-১৩ লক্ষ
৩.	ছাতিয়ান-Alstonia scholaris	মার্চ-এপ্রিল	২৫০,০০০-২৮০,০০০
৪.	বৈলাম-Anisoptera scaphula	এপ্রিল-জুন	১০০-১৫০

নং	প্রজাতির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা
৫.	পিতরাজ- <i>Aphanamixis polystachya</i>	মার্চ-এপ্রিল	১১০০-১২০০
৬.	আগর- <i>Aquilaria agallocha</i>	জুলাই-আগস্ট	১১০০-১২০০
৭.	চাপালিশ, চাস্বল- <i>Artocarpus chama</i>	জুন-জুলাই	৮০০-৫০০
৮.	বর্তা- <i>Artocarpus lacucha</i>	মে-জুলাই	৫০০-৭০০
৯.	হিজল- <i>Barringtonia acutangula</i>	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	২০০০-২১০০
১০.	কানজল- <i>Bischofia javanica</i>	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	৯২,০০০-১,০০,০০০
১১.	শিমুল- <i>Bombax ceiba</i>	এপ্রিল-মে	২৫,০০০-২৬,০০০
১২.	পলাশ- <i>Butea monosperma</i>	মে-জুন	৬০০-৮০০
১৩.	পুন্ড্যাল, পানিয়াল- <i>Calophyllum inophyllum</i>	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	২৫০-৩০০
১৪.	সোনালু - <i>Cassia fistula</i>	নভেম্বর-ডিসেম্বর	৬,০০০-৭,০০০
১৫.	বাটনা, শিল বাটনা- <i>Castanopsis indica</i>	জুলাই-আগস্ট	১০০০-১৩০০
১৬.	চিকরাশি- <i>Chukrasia velutina</i>	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	৪৫,০০০-৫০,০০০
১৭.	বরঞ, লাত্তুম, পিতাগুলা- <i>Crataeva magna</i>	জুলাই-সেপ্টেম্বর	২০,০০০-২৫,০০০
১৮.	চালতা- <i>Dillenia indica</i>	অক্টোবর-ডিসেম্বর	৫১,০০০-৫৩,০০০
১৯.	হারগাজা, আজুলি- <i>Dillenia pentagyna</i>	জুন-জুলাই	৩৭,০০০-৫১,০০০
২০.	তেলি গর্জন- <i>Dipterocarpus turbinatus</i>	মে-জুন	১৫০-১৭০
২১.	বান্দরছুলা- <i>Duabanga grandiflora</i>	এপ্রিল-মে	২৪ লক্ষ
২২.	উদাল, উজাল- <i>Firmiana colorata</i>	এপ্রিল-মে	৫,৬০০-৬,০০০
২৩.	বারেলা, ঝাউয়া- <i>Holigarna caustica</i>	জুলাই-আগস্ট	১২০০-১৫০০
২৪.	তেলসুর- <i>Hopea odorata</i>	মে-জুন	১,৮০০-২,০০০
২৫.	চালমুগরা- <i>Hydnocarpus kurzii</i>	নভেম্বর-ডিসেম্বর	৩০০-৩৫০
২৬.	সিদা জাঙ্গল- <i>Lagerstroemia parviflora</i>	জানুয়ারি-মার্চ	৩০,০০০-৬০,০০০
২৭.	মেঙ্কা, মেদা- <i>Litsea monopetala</i>	মে-জুলী	৫৩০০-৫৫০০
২৮.	রক্তন- <i>Lophopetalum fimbriatum</i>	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	৫২০০-৫৫০০
২৯.	মহঘ্যা- <i>Madhuca indica</i>	জুন-জুলাই	২০০০-৩০০০
৩০.	উরিআম- <i>Mangifera sylvatica</i>	মে-জুন	৩৫-৪৫
৩১.	নাগেশ্বর- <i>Mesua nagassarium</i>	জুলাই-সেপ্টেম্বর	১০০০-১৫০০
৩২.	চম্পা- <i>Michelia champaca</i>	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	১০,০০০-১২,০০০
৩৩.	গান্দি-গজারি, বুল-গজারি- <i>Miliusa velutina</i>	মে-জুন	৫০০০-৬০০০

নং	প্রজাতির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম	বীজ সংগ্রহের সময়	কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা
৩৪.	বাঁশপাতা- <i>Podocarpus nerifolia</i>	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	৪৫০-৫০০
৩৫.	গটগুটা, নিউর, লুও-বাদি- <i>Protium serratum</i>	আগস্ট-জুলাই	১২০০ - ১৫০০
৩৬.	মুস, মুসিগঙ্গা- <i>Pterospermum acerifolium</i>	মার্চ-এপ্রিল	৬০০-৭০০
৩৭.	বুদ্ধ নারিকেল, নারিকেলি- <i>Pterygota alata</i>	এপ্রিল-জুন	৭০০-৮০০
৩৮.	অশোক- <i>Saraca asoca</i>	জুন-জুলাই	৫০-৬০
৩৯.	কনক, মন-চাম্পা, বোনাক- <i>Schima wallichii</i>	এপ্রিল-জুন	১৬০,০০০-৩৫০,০০০
৪০.	কুসুম, জয়না- <i>Schleichera oleosa</i>	জুন-জুলাই	১৫০০-২২০০
৪১.	ধারমারা- <i>Stereospermum personatum</i>	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	৭৫,০০০-৮০,০০০
৪২.	আমচুভুল, সিভিটি- <i>Swintonia floribunda</i>	এপ্রিল-মে	৭৫০-৮০০
৪৩.	কাল জাম- <i>Syzygium cumini</i>	জুন-আগস্ট	১৫০০-১৭০০
৪৪.	ঢাকি জাম- <i>Syzygium grandis</i>	জুন-জুলাই	১১০-১১৫
৪৫.	তেতুল- <i>Tamarindus indica</i>	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	৮০০-১০০০
৪৬.	অর্জুন- <i>Terminalia arjuna</i>	মার্চ-এপ্রিল	৩০০-৫০০
৪৭.	বেহো- <i>Terminalia bellerica</i>	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	২০০-২৫০
৪৮.	হরিতকি- <i>Terminalia chebula</i>	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	১৫০-১৬০
৪৯.	তুন- <i>Toona ciliata</i>	মার্চ-এপ্রিল	১৪০,০০০-১৫০,০০০
৫০.	আরশুল, হরিনা, গুদা- <i>Vitex glabrata</i>	মে-জুলাই	৪০০-৫০০
৫১.	বাজনা- <i>Zanthoxylum rhetsa</i>	আগস্ট-অক্টোবর	১৮,০০০-১৯,০০০

সারণী - ৫: বাংলাদেশের কিছু বিগন্ন প্রজাতির বীজের অক্তুরোদগম হার, অক্তুরোদগমের সময় ও শুদ্ধাংশজাত করার মেয়াদ

নং	প্রজাতির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম	অক্তুরোদগমের হার (%)	অক্তুরোদগমের সময় (দিন)	সাধারণ তাপমাত্রায় কতদিন সংরক্ষণ করা যায়
১.	খয়ের- <i>Acacia catechu</i>	৮০-৯০	১০-২০	১ বছর
২.	হলদ, কাইকা- <i>Adina cordifolia</i>	৮০-৫০	১২-১৫	৫-৬ মাস
৩.	ছাতিয়ান- <i>Alstonia scholaris</i>	৬০-৬৫	৮-১০	৩-৪ মাস
৪.	বৈলাম- <i>Anisoptera scaphula</i>	৭০-৮০	৫-৭	৭-১০ দিন
৫.	পিতরাজ- <i>Aphanamixis polystachya</i>	৫০-৬০	২০-২৫	৫-৭ দিন
৬.	আগর- <i>Aquilaria agallocha</i>	৬০-৭০	৭-২০	৫-৭ দিন
৭.	চাপালিশ, চাখল- <i>Artocarpus chama</i>	৭০-৮০	১০-১২	২০-৩০ দিন

নং	প্রজাতির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম	অঙ্কুরোদগমের হার (%)	অঙ্কুরোদগমের সময় (দিন)	সাধারণ তাপমাত্রায় কর্তৃদিন সংরক্ষন করা যায়
৮.	বর্তা- <i>Artocarpus lacucha</i>	৫০-৬০	১৮-২০	১০-১৫ দিন
৯.	হিজল- <i>Barringtonia acutangula</i>	৬০-৭০	১০-১৫	৪-৬ মাস
১০.	কানজল- <i>Biscindofia javanica</i>	৬০-৭০	৭-১০	৭-১০ দিন
১১.	শিমুল- <i>Bombax ceiba</i>	৬০-৭০	৭-১০	১-২ মাস
১২.	পলাশ- <i>Butea monosperma</i>	৫০-৬০	১০-১৫	৭-১০ দিন
১৩.	পূম্যাল, পানিয়াল- <i>Calophyllum inophyllum</i>	৬০-৭০	২৫-৩০	৭-১০ দিন
১৪.	সোনালু- <i>Cassia fistula</i>	৫০-৬০	২০-৩০	১ বছর
১৫.	বাটনা, শিল-বাটনা- <i>Castanopsis indica</i>	৪০-৫০	৯০-১২০	২০-২৫ দিন
১৬.	চিকরাশি - <i>Chukrasia velutina</i>	৫০-৫৫	১০-১৫	১-২ মাস
১৭.	বরুনা, লাডুম, পিতাগুলা- <i>Crataeva magna</i>	২০-৩০	৩০-৬০	২০-২৫ দিন
১৮.	চলতা- <i>Dillenia indica</i>	৪০-৫০	২০-৩০	৪০-৪৫ দিন
১৯.	হারগাজা, আজুলি- <i>Dillenia pentagyna</i>	৪০-৫০	৪৫-৬০	৯-১২ মাস
২০.	তেলি গর্জন- <i>Dipterocarpus turbinatus</i>	৭০-৮০	১০-১২	৭-১০ দিন
২১.	বান্দরহুলা- <i>Duabanga grandiflora</i>	২৫-৩০	৩০-৩৫	১ বছর
২২.	উদাল, উজাল- <i>Firmiana colorata</i>	৪০-৪৫	১০-১৫	২০-২৫ দিন
২৩.	বারেলা, ঝাউয়া- <i>Holigarna caustica</i>	৫০-৬০	২০-২৫	৩০-৩৫ দিন
২৪.	তেলসুর- <i>Hopea odorata</i>	৭০-৮০	৮-৫	৭-১০ দিন
২৫.	চালমুগরা- <i>Hydnocarpus kurzii</i>	৪০	৬০-৬৫	২০-২৫ দিন
২৬.	সিদা জাকুল- <i>Lagerstroemia parviflora</i>	২০-২২	১৫-২০	২-৩ বছর
২৭.	মেঙ্কা, মেদা- <i>Litsea monopetala</i>	৬০	২০-২৫	২০-৩০ দিন
২৮.	বক্তন- <i>Lophopetalum fimbriatum</i>	৪০	১৫-২০	১০-১৫ দিন
২৯.	মহয়া- <i>Madhuca indica</i>	৬০-৭০	১০-১৫	১-২ মাস
৩০.	উরিআম- <i>Mangifera sylvatica</i>	৬৫-৭৫	১৫-২০	১০-১৫ দিন
৩১.	নাগেশ্বর- <i>Mesua nagassarium</i>	৭০-৮০	১০-১৫	৭-১০ দিন
৩২.	চম্পা- <i>Michelia champaca</i>	৬০-৭০	৭-১০	১০-১২ দিন
৩৩.	গান্দি-গজারি, বুল-গজারি- <i>Miliusa velutina</i>	৫০-৬০	১২-১৫	৭-১০ দিন
৩৪.	বাঁশ পাতা- <i>Podocarpus nerifolia</i>	৭০-৮০	৮-১০	৫-৭ দিন
৩৫.	গুটগুট্যা, নিউর, লুও-বাদি- <i>Protium serratum</i>	৩০-৪০	০-২৫	১৫-২০ দিন

নং	প্রজাতির স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম	অঙ্কুরোদগমের হার (%)	অঙ্কুরোদগমের সময় (দিন)	সাধারণ তাপমাত্রায় কর্তব্য সংরক্ষণ করা যায়
৩৬.	মুস, মুসিগান-Pterospermum acerifolium	৫৫-৬৫	১২-১৫	৭-১০ দিন
৩৭.	বুরু নারিকেল, নারিকেলি-Pterygota alata	৫০-৬০	৮-১০	১৫-২০ দিন
৩৮.	অশোক-Saraca asoca	৭০	৭-১৫	১৫-২০ দিন
৩৯.	কনক, মন-চাম্পা, বোনাক-Schima wallichii	৪০-৫০	১০-১৫	৩-৫ মাস
৪০.	কুসুম, জয়না-Schleichera oleosa	৮০-৯০	১০-৯০	৬ মাস
৪১.	ধারমারা-Stereospermum personatum	৬০	৭-১০	৬ মাস
৪২.	আমচুল্ল, সিভিটি-Swintonia floribunda	৭০-৮০	৫-৭	৭-১০ দিন
৪৩.	কালজাম-Syzygium cumini	৭০-৮০	১০-৩০	২০-৩০ দিন
৪৪.	চাকিজাম-Syzygium grandis	৭০-৮০	২০-২৫	১-২ মাস
৪৫.	তেতুল-Tamarindus indica	৭০-৮০	৭-১০	১ বছর
৪৬.	অর্জুন-Terminalia arjuna	৬০-৭০	১০-১৫	৪-৫ মাস
৪৭.	বহেরা-Terminalia bellerica	৮০-৯০	১০-১২	৬-১২ মাস
৪৮.	হরিতকি-Terminalia chebula	৬০	১০-২০	১-২ মাস
৪৯.	তুন-Toona ciliata	৫০-৬০	৭-১০	১ মাস
৫০.	আরঙ্গল, হরিনা, গুদা-Vitex glabrata	৫৫-৬০	১৫-২০	১-২ মাস
৫১.	বাজনা-Zanthoxylum rhetsa	৫০-৬০	১৫-২০	১-২ মাস

৪.২ বীজ সংরক্ষণ

বিভিন্ন গাছের ফল বিভিন্ন সময়ে পরিপক্ষ হয়। অনেক সময় পরিপক্ষ ফল থেকে উন্নত মানের বীজ সংগ্রহের পর তা সঙ্গে সঙ্গে বীজ তলায় বপন করার প্রয়োজন হয় না। সেক্ষেত্রে বীজ সংগ্রহ ও শোধনের পর বীজ বপনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে হয়। পরিপক্ষ বীজ সংগ্রহ করে বীজের গুণগতমান ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তা বপনের পূর্ব পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানসম্মতভাবে সংরক্ষণ করাকে বীজ সংরক্ষণ বলে। বীজ সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করার উপর নির্ভর করে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ও তার সজীবতা। বীজ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে বীজে নানা ধরনের পোকামাকড়, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি ক্ষতিকারক জীব-অণুজীব উপাদান দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ও সজীবতা হারিয়ে ফেলে।

বীজ সংরক্ষণের সময় বিবেচ্য বিষয়

বীজ সংরক্ষণের উপর বীজের অঙ্কুরোদগমের হার নির্ভর করে। বীজ সংরক্ষণের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল বীজের মধ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ ও সংরক্ষণ পাত্রের বৈশিষ্ট্য। বীজ সংরক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে:

- সংরক্ষণের জন্য বীজ উত্তমরূপে শুকিয়ে নিতে হবে।
- অতঃপর শুকনো বীজ যথাসম্ভব চালুনি দিয়ে খেড়ে নিতে হবে।
- একটি সমতল ও পরিক্ষার জায়গায় বীজ শুকানো উচিত।
- পলিথিন, চট, পাটি প্রভৃতি বীজ শুকানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ফাঁকা মেঝেতে সরাসরি বীজ শুকানো উচিত নয়।

এছাড়াও

১. যে পাত্রে বীজ সংরক্ষিত হবে তা বায়ুরোধক হতে হবে।
২. বীজ সংরক্ষণের কক্ষ বা ঘরটি আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত হতে হবে যাতে ঘরটি স্যাঁতসেতে না হয়।
৩. বীজের তাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪. যে সকল বীজ স্বাভাবিক পরিবেশে অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অথবা যেগুলির অঙ্গুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস পায়, সেসব বীজ রেফিজারেটরে সংরক্ষণ করা যায়। এতে ছত্রাক ও অনিষ্টকারী পোকার আক্রমণ ঘটে না, যেমন- জারঞ্জ, নিম প্রভৃতি।
৫. বীজপাত্রের গায়ে প্রজাতির নাম, সংগ্রহের স্থান, সংগ্রহের তারিখ, বীজের পরিমাণ, কতটি মাত্রবৃক্ষ থেকে সংগৃহিত হয়েছে, সংগ্রহকারীর নাম প্রভৃতি তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।
৬. পত জাতীয় বীজ, যেমন কড়ই, শিরিষ প্রভৃতি পোকায় বেশী আক্রান্ত হয়। তাই এসব প্রজাতির বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে। নিমপাতা বা নিশিন্দাপাতা উত্তমরূপে শুকিয়ে বীজ সংরক্ষিত পাত্রে রেখে পোকার আক্রমণ রোধ করা যেতে পারে।
৭. বীজে যদি ছত্রাক আক্রমণের প্রকোপ দেখা দেয়, তাহলে বীজগুলিকে নিম বা তামাক পাতার রসে ডুবিয়ে রোদে শুকালে ভাল ফল পাওয়া যায়। অনেক সময় ন্যাপথালিন দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

৪.৩ বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি

নানা পাত্র বা মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণ করা যায়, যেমন-

১. **বন্ধ:** বাতাসের সংস্পর্শে এলেও যে বীজের সজীবতা বজায় থাকে সেসকল বীজ চটের বা প্লাস্টিকের বন্ধায় সংরক্ষণ করা যায়।
২. **প্লাস্টিকের ব্যাগ:** প্লাস্টিক ব্যাগে বীজ ভরে মুখ ভাল করে বন্ধ করে রাখলে বীজ দীর্ঘদিন ভাল থাকে। ব্যাগের ভিতরে বাতাস চলাচল করতে পারেনা বলে বীজের সার্বিক গুণাবলী বজায় থাকে।
৩. **প্লাস্টিক বৈয়াম:** প্লাস্টিক বৈয়ামে অল্প ব্যয়ে দীর্ঘদিন বীজ সংরক্ষণ করা যায়। বীজ রেখে পাত্রের মুখ শক্ত করে আটকে দিলে বীজ দীর্ঘদিন ভাল থাকে। যেসব বীজ আকারে ছোট, সেসব বীজ প্লাস্টিকের বৈয়ামে রাখা সুবিধাজনক। মাঝে মাঝে বৈয়ামের মুখ খুলে রোদে শুকাতে দিলে বীজের গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে। যেমন, কড়ই, বাবলা, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি।

- ৪. মটকা বা মাটির পাত্র:** গ্রামাঞ্চলে বীজ সংরক্ষণে মটকার ব্যবহার খুবই প্রচলিত। বেশী পরিমাণে বীজ সংরক্ষণ করতে হলে মটকা ভাল। তবে মটকাটি মাঝে মাঝে রোদে শুকাতে হবে, যাতে করে সংরক্ষিত বীজ ছ্রাক ও পোকা মাকড় দ্বারা আক্রান্ত না হয়। মটকার মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে রাখা ভাল। মটকাটি ঘরের এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে আলো বাতাস চলাচল করে।
- ৫. রেফিজারেটর:** এটি বীজ সংরক্ষণের একটি অত্যধূমিক পদ্ধতি। আধুনিক বীজ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে রেফিজারেটরে বীজ সংরক্ষণ করা যায়। অধিকাংশ বীজই ৪-৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। যেসব বীজ ৬ মাসের অধিক রাখা প্রয়োজন এবং ছ্রাক ও পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব বীজ রেফিজারেটরের রাখা উচিত। যেমন: শিলকড়ই, শিরিয়, কদম, জারুল প্রভৃতি।
- ৬. পলিথিন প্যাকেট:** সাধারণতঃ বাণিজ্যিক বীজ বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলিই পলিথিন প্যাকেটে বীজ সংরক্ষণ ও বাজারজাত করে থাকে। বর্তমানে এটি খুবই জনপ্রিয় বিধায় বাজারে বিভিন্ন সাইজের পলিথিন প্যাকেট পাওয়া যায়। এগুলি পরিবহণ ও খুবই সুবিধাজনক। সর্বোপরি, প্যাকেটের গায়ে বীজের যাবতীয় তথ্য সুন্দর করে ছাপানো যায়। তাছাড়া, প্যাকেটের ভেতরে অতিরিক্ত আর্দ্রতা সহজে প্রবেশ করতে পারে না।
- ৭. ড্রাম, টিনের পাত্র প্রভৃতি:** বেশি পরিমাণ বীজ সংরক্ষণে ড্রাম বা টিনের পাত্র ব্যবহার করা হয়। বীজ ভরতি ড্রাম বা টিনের মুখ খুব ভালভাবে আটকাতে হবে। মাঝে মাঝে ড্রাম বা টিনের মুখ খোলা রাখলে ভাল হয়।
- কোন কোন গাছের বীজ যেমন- গর্জন, শাল, তেলসুর, ঢাকিজাম, চাপালিশ ইত্যাদির বীজ গুদামজাত বা সংরক্ষণ করা যায় না। গাছ থেকে সংগ্রহের পরপরই ২-৩ দিনের মধ্যে রোপণ করতে হয়। তবে স্যাতসেতে ছায়া ও ঠান্ডাযুক্ত জায়গায় এ সব বীজ ছড়ায়ে হালকা পানির ছিটা দিয়ে অংকুরোদগম ক্ষমতা কিছুদিন বাড়ানো যায়।

বীজ বিবরণ বা বীজের তথ্য লিখন

যে বীজটি সংরক্ষণ করা হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখা আবশ্যিক। যে পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করা হয়, সর্তকাতর জন্য তার ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই লেবেল লাগানো উচিত। লেবেলে প্রজন্মির নাম, বীজ সংগ্রহের তারিখ, মার্গাগাছের সংখ্যা, সংরক্ষণের তারিখ, স্থান, বীজের পরিমাণ, অংকুরোদগম হার ইত্যাদি বিবরণ লিখে রাখতে হবে।

৪.৪ বপনের আগে বীজ শোধন ও বপন পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াকরণ

বীজই হল ভবিষ্যৎ বৃক্ষের প্রাণকেন্দ্র। তাই, এর সঠিক সংরক্ষণের উপরই আগামী উদ্দিদি প্রজন্ম নির্ভরশীল। বীজ সংরক্ষণের আগে শোধন না করলে বীজ নানা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অশোধিত বীজ থেকে উৎপন্ন চারা দুর্বল হয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বীজ তার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। বীজ শোধনের উপকারিতা হল-

১. বীজের গায়ে অনুজীব বা পরজীবী লেগে থাকলে তা ধ্বংস হয়,
২. বীজের অভ্যন্তরীণ রোগজীবাণু নষ্ট হয়ে যায়,
৩. বপনকৃত বীজ ও সদ্য গজানো চারার সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

ভাল ফল লাভের জন্য নার্সারিতে বপনের আগে বিভিন্ন ধরনের বীজ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শোধন করা প্রয়োজন। শোধনের ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। নিম্নে বীজ শোধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

- ১. পানিতে ভাসিয়ে:** যেসব অপৃষ্ট বীজ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাশূন্য বা কীটাক্রান্ত, সেসব বীজ পানিতে ভেসে থাকে, পুষ্টবীজ পানিতে ভুবে যায়। কাজেই বীজ পানিতে ভুবিয়েই অপৃষ্ট ও কীটাক্রান্ত বীজ আলাদা করা যায়।
- ২. পানিতে ভিজিয়ে:** বীজের মধ্যে সুষ্ঠু অবস্থায় যে ক্রণ রয়েছে তা পানির সংস্পর্শে এলে অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। তাই বপনের আগে সব বীজকেই পানিতে ভিজিয়ে নার্সারিতে লাগানো হয়। পানিতে ভিজালে বীজের খোসা নরম হয়। সাধারণত বীজ ১২- ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলেই হয়। তবে কড়ই জাতীয় গাছের বীজ বা পুরু খোসাযুক্ত বীজের ফেঁতে বপনের আগে শোধনের জন্য অধিক সময় ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- ৩. গরম পানিতে ভিজিয়ে:** কড়ই, ইপিল-ইপিল, রেইনট্রি জাতীয় বীজ হালকা গরম পানিতে (40° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) ১-৩ মিনিট রাখলে বীজের অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। আকাশমনি ও ম্যানজিয়াম বীজকে শোধনের জন্য ফুটস্ট পানিতে চুলা থেকে নামিয়ে ৩০ সেকেন্ড রাখলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন ক্রমেই ৩০ সেকেন্ডের বেশী না রাখা হয়। অন্যথায় বীজের ভ্রগ নষ্ট হয়ে যাবে।
- ৪. ভিজানো-শুকানো পদ্ধতি**
সেগুন বীজের ফেঁতে এ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। সেগুন বীজ চটের বস্তায় ভরে ২৪ - ৪৮ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। অতঃপর বীজ সহ বস্তা একদিন রোদে শুকাতে হয় এবং আবার ২৪ ঘন্টা ভিজাতে হয়। পরে চটের ব্যাগ থেকে বীজ গুলি বের করে শান বাঁধানো স্থানে বিছিয়ে রেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে, চটের বস্তা দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে হয়। এভাবে ১০- ১৫ দিন রাখলে চটের বস্তার গরমে সেগুন বীজ ফেঁটে অঙ্কুরিত হয়। সেগুন বীজের ন্যায় অন্যান্য যে সমস্ত বীজের গায়ে পুরু ত্বক আছে সেসব বীজকে (যেমন- অর্জুন, খেজুর, বহেরা, বাটনা, হরিতকি ইত্যাদি) এই পদ্ধতিতে শোধন করা হয়।
- ৫. পিট পদ্ধতি**
সেগুনের বীজকে সনাতন পদ্ধতিতেও প্রক্রিয়াজাত করা যায়। এ পদ্ধতিকে গর্তে পোতা বা পিট পদ্ধতি বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সেগুন বীজকে ১ মিটার বর্গাকার ও ১ মিটার গভীর গর্তে রেখে তা পানি দিয়ে ভরাট করা হয়। গর্তের তলায় ও পাশে সেগুন পাতা বিছিয়ে দেওয়া হয়। ৪৮ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা বীজ গর্তে এমনভাবে দিতে হবে, যেন এক স্তর বীজের উপর এক স্তর সেগুন পাতা, আর এক স্তর বীজ ও এক স্তর সেগুন পাতা, এভাবে সাজিয়ে গর্ত ভরাট করে উপরে ১২-১৫ সে.মি. মাটি দিয়ে গর্ত বক্স করে দিতে হবে। গর্তে মাটি ভরাট করার আগে ঠিক মাঝখানে ও চারকোনায় চারটি বাঁশের চোঙা তির্যকভাবে পুঁতে দেওয়া হয়। এগুলি দিয়ে গর্তে পানি সরবরাহ করা হয়। বীজ গর্তে ১০ দিন রাখা হয়। একদিন অন্তর চোঙা দিয়ে পানি দেওয়া হয়। ১০ দিন পর মাটি ও পাতা সরিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। দেখা যায়, বীজে অঙ্কুরোদগম শুরু হয়ে গেছে এবং এ বীজ নার্সারি বেডে লাগানো হয়।

৪.৫ বীজের পরিমাণ নির্ণয় ও বীজ বপন

বীজের পরিমাণ নির্ণয়করণ

কোন নার্সারিতে কোন প্রজাতির কি পরিমাণ চারা উত্তোলন করা হবে, তা নার্সারির জমির পরিমাণ, এলাকার চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রা, বীজের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য (যেমন- বীজের অঙ্কুরোদগম হার, বীজের আকার ও ওজন) ইত্যাদি বিবেচনা করে বীজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

বীজ বপনের সময়

বীজ কখন বপন করতে হবে তা নির্ভর করে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার স্থায়িত্বকালের (Seed viability) উপর। কোন কোন বীজ গাছ থেকে সংগ্রহের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বপন করতে হয়। যেমন শাল, গর্জন আগর ইত্যাদি। বাংলাদেশে সাধারণত শীতের পর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে নার্সারিতে বীজ বপন করতে হয়। অন্য দিকে পাইন জাতীয় চারা উত্তোলনের জন্য শীতকালই উন্নত সময়।

বীজ বপন পদ্ধতি: বীজ বপন প্রক্রিয়াকে সাধারণতঃ ৪ ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন:

১. ট্রেতে বীজ বপন,
২. সিড বেডে বীজ বপন,
৩. নগুশিকড় ও স্টাম্প উত্তোলনের জন্য বীজ বপন, ও
৪. পট বা ব্যাগে সরাসরি বীজ বপন।

৪.৫.১. ট্রেতে বীজ বপন

- শুধুমাত্র বীজের অঙ্কুরোদগম ও ছোট চারা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যাগে চারা স্থানান্তর বা পুনঃরোপণের জন্য ট্রেতে বীজ গজিয়ে চারা উৎপন্ন করা হয়। যেসব বীজ আকারে অতি ক্ষুদ্র সেগুলোকে ট্রেতে বপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে ট্রেতে সাধারণতঃ হলদু, কদম ইত্যাদির বীজ বপন করা হয় (ছবি - ১৯)। এতে যত্ন ও পরিবহনের সুবিধা হয়। ট্রের জন্য প্লাস্টিকের ঝুরি, কাঠের বাক্স বা বাঁশের ঝুরি ব্যবহার করা হয়। ট্রের তলায় ছিদ্র থাকতে হবে, যাতে পানি নিঃসরণ তাড়াতাড়ি হয়। অঙ্কুরোদগমের পর চারা ব্যাগে স্থানান্তরিত করা হয়।

নিম্নলিখিতভাবে ট্রেতে চারা উত্তোলন করে পলিব্যাগে স্থানান্তরিত করা হয়।

- ট্রেতে মাটি ভরাট করার আগে সিড বেডের মাটির ন্যায় মাটি ও নুড়ি শোধন করতে হবে। সাধারণত: মাটিতে তাপ প্রয়োগ করে শোধন করা হয়। ট্রে ভরাট করার জন্য নিম্নলিখিত স্তর স্থাপন করতে হবে:

নিম্নস্তর: একটি পাতলা মার্কিন কাপড়ের উপর ৫ সে. মি. মত ইট পাথরের গুঁড়া দিতে হবে।

মধ্যস্তর : ৫ সে. মি. মত পুরু ছোট নুড়ি পাথর দিতে হবে।

উর্ধ্বস্তর: ৫ সে. মি. মত পুরু শোধিত ঝুরঝুরে বেলে মাটি ও ছাই দিতে হবে।



ছবি ১৯: ছোট বীজ সমূহ ট্রেতে বপন করাই উত্তম।

- বীজ বপনের পর বালি বা ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে হালকাভাবে বীজ ঢেকে দিতে হবে, যাতে বীজ দেখা না যায়। অতঃপর একটি পানিভর্তি বড়পাত্রে ট্রে নীচ হতে ২/৩ ভাগ চুকিয়ে পানি সেচ দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই ট্রের উপর দিয়ে পানি সেচ দেয়া যাবেনা।
- বীজ বপনের পর ট্রে শোধিত আবদ্ধ কক্ষে রাখতে হবে। কারণ, স্যাঁতসেতে উষ্ণ অবস্থায় বীজ ভাল গজায়। পলিথিনের সিট দিয়ে ঘরের মত গ্রীন হাউজ তৈরি করেও ট্রে রাখা যায়। চারার কাও পঁচা (Damping off) ছত্রাক রোগ দমনের জন্য ট্রে সমূহ গ্রীন হাউজের পরিবর্তে আবদ্ধ ঘরে রাখলে সকালে ও বিকালে ট্রে গুলিকে হালকা রোদের সংস্পর্শে আনতে হবে। ট্রের চারার কাও পঁচা রোগ দেখা দেওয়া মাত্র পাস্প স্প্রের সাহায্যে কোণ্ঠাভিট দ্রবণ ছিটাতে হবে। স্প্রে ছাড়া সেচের পানিতে মিশিয়ে এ রোগ দমন করা যায়। তবে এ রোগ দেখা দিলে পানি সেচ দেওয়া উত্তম।
- অঙ্কুরোদগমের পর চারা চার পাতা বিশিষ্ট হলে মাটি সহ ছোট কাঠি দ্বারা তুলে পলিব্যাগে স্থানান্তরিত করতে হবে। এ সময় স্থানান্তরিত চারাকে অবশ্যই ছায়া দিতে হবে।

৪.৫.২ সিড বেডে বীজ বপন

শোধনকৃত বেডের মাটি হালকা করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বীজ বপন করতে হয়। বেডে বীজের পরিমাণ প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। স্টাম্প তৈরি বা বড় চারার জন্য যদি নাসারি বেড করা হয়, তাহলে $12.2 \text{ মিটার} \times 1.2 \text{ মিটার}$ সাইজের বেডে প্রজাতিভেদে বীজের পরিমাণ ভিন্ন হয়, যেমন : জারুল - ২৫০ গ্রাম,

তুন - ৬০ গ্রাম, কদম - ৪০ গ্রাম ও শিমুল - ৫০০ গ্রাম। একটি $12.2 \text{ m.} \times 1.2 \text{ m.}$ মিটার সাইজের সিড বেড থেকে $10,000 - 15,000$ টি ছোট চারা পাওয়া যেতে পারে। তবে শিশু, কদম ইত্যাদির বেলায় গড়ে $5,000 - 10,000$ টি চারা পাওয়া যায়। সিড বেডে বীজ বপনের আগে অল্প পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নিতে হয়। নিম্নলিখিত ভাবে সিড বেডে বীজ বপন করতে হয়।

ছিটানো পদ্ধতি

ছোট আকারের বীজ সরাসরি সমভাবে ছিটানো হয়, যেমন: তুন, জারুল, শিশু, শিমুল ইত্যাদি।

লাইন পদ্ধতি

বড় আকারের বীজ, যেমন- কাঁঠাল, চাপালিশ ইত্যাদি মাটি খুঁড়ে $5 - 10 \text{ cm. m.}$ দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে বপন করা হয়। একটি $12.2 \times 1.2 \text{ m.}$ মিটার সাইজের নার্সারি বেড থেকে গড়ে $2500 - 3000$ টি চারা বা স্টাম্প পাওয়া যায়। স্বল্প মেয়াদী প্রজাতির জন্য সারিতে বীজ থেকে অপর বীজের দূরত্ব হবে 5 cm. m. এবং দীর্ঘ মেয়াদী চারার জন্য 10 cm. m.

৪.৫.৩ নগুশিকড় স্টাম্প উত্তোলনের জন্য বেডে বীজ বপন

কোন কোন প্রজাতির স্টাম্প রোপণ করলে গাছের বৃদ্ধি ত্বরিত হয়। সেসব ক্ষেত্রে চারা রোপনের পরিবর্তে স্টাম্প রোপণ করা হয়। যেমন- সেগুন, জারুল, গামার, শিমুল ইত্যাদি। একটি চারার 15 cm. m. শিকড় ও 2.5 cm. m. কাণ নিয়ে রোপনের জন্য স্টাম্প তৈরি করা হয়।

৪.৫.৪. পটে বা ব্যাগে বীজ বপন

বর্তমানে নার্সারিতে সাধারণত: তিনি আকারের ব্যাগ ব্যবহার করা হয়: $10 \times 15 \text{ cm. m.}$ বা $12 \times 18 \text{ cm. m.}$ বা $15 \times 25 \text{ cm. m.}$ । কোন্ আকারের ব্যাগ ব্যাবহার করতে হবে তা নির্ভর করে কোন্ প্রজাতির চারা ব্যাগে উত্তোলিত হবে এবং চারাগুলি কতদিন পর্যন্ত নার্সারিতে রাখা হবে তার ওপর। অপেক্ষাকৃত বড় বীজ সরাসরি পলিব্যাগে বপন করা হয়। **সাধারণত:** প্রতি ব্যাগে ২টি করে বীজ বপন করা হয়। তবে বীজের অঙ্কুরোদগমের হারের উপর নির্ভর করে ভিন্ন হারে বীজ দেওয়া যেতে পারে। **সাধারণত:** বীজের আয়তন যত, সে পরিমাণ মাটি বীজের উপরে দিতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ নার্সারিতে চারার ঘন্টা ও পরিচর্যা

বীজের অঙ্কুরোদগম এবং ভৃগুকুল পরিস্থৃতিত হওয়ার পর সুস্থ-সবল চারা তৈরির জন্য ধারাবাহিকভাবে চারার বিশেষ ঘন্টা নেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে:

৫.১.১. ছায়া প্রদান

অঙ্কুরোদগম থেকে বৃক্ষির প্রাথমিক ধাপ পর্যন্ত অধিকাংশ চারা গাছই তাপ ও আলোর প্রতি খুবই সংবেদনশীল থাকে, যা স্বাভাবিক বৃক্ষির উপর প্রভাব ফেলে এবং চারার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সুতরাং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে বীজ বপনের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছায়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

- বিভিন্ন প্রজাতির ছায়ার প্রয়োজন বিভিন্ন রকম হয় এবং তা উৎপাদন মৌসুম ও বৃক্ষির উপর নির্ভর করে। অঙ্কুরোদগমের সময় অধিকাংশ প্রজাতির ক্ষেত্রেই ছায়ার প্রয়োজন। ছায়া মাটিকে ঠাণ্ডা ও আর্দ্র রাখে যা অঙ্কুরোদগমের পূর্বশর্ত। কিছু আলো পছন্দকারী প্রজাতি রয়েছে যেগুলির ছায়া ছাড়াই অঙ্কুরোদগম ঘটে, যেমন - সেগুন, গামার, আম, কাঠাল ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ বৃক্ষ প্রজাতিই গজানোর পর আঁশিক ছায়া পছন্দ করে।
- নতুন বা সদ্য উঠানে চারাগাছের জন্য দিনের বেশিরভাগ সময় ছায়া প্রদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ (চারা গাছগুলিকে কেবল সকালে এবং বিকালে রোদে রাখা যেতে পারে)।
- ক্রমান্বয়ে ছায়া প্রদানের সময় কমানো উচিত।

৫.১.২. সেচ বা পানি দেওয়া

চারা গাছের বৃক্ষি এবং টিকে থাকার জন্য নিয়মিত পানি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তবে অতিরিক্ত পানি সব সময়েই ক্ষতিকর। পানি নিয়মিত, পরিমিত এবং ঘন্টা সহকারে দেওয়া উচিত। পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন:

- মূল প্রতিষ্ঠা না হলে প্রথম সপ্তাহে দিনে দুইবার পানি দেওয়া,
- প্রথম সপ্তাহের পর দিনে একবার করে পানি দিতে হবে। পানি এমনভাবে দিতে হবে যাতে পলিব্যাগের তলায় পানি পৌছাতে পারে,
- বিকালে পানি দেওয়া উচ্চম, যাতে অধিকাংশ পানি মাটি দ্বারা শোষিত হয়,
- পানির প্রবাহের সঙ্গে মাটি যাতে ধুয়ে না যায় এবং সদ্য গজানো কোমল চারা ভেঙে বা নেতৃত্বে না পড়ে, সেজন্য সব সময়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র বা নজেল বিশিষ্ট ঝাঁঁঝারি ব্যবহার করতে হবে,
- সমগ্র বীজতলায় সমানভাবে পানি দেওয়া উচিত,
- অতিরিক্ত পানি চারাগাছের মূলের বৃক্ষি ব্যাহত করে বা কমিয়ে দেয় এবং কাষকে লম্বা, নরম ও গাছকে রোগাক্রমগ্রের অনুকূল করে তোলে।

৫.১.৩. আগাছা দমন

পানি, পুষ্টি উপাদান এবং সুর্যালোক ইত্যাদির জন্য আগাছা চারাগাছের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। ফলে চারাগাছের বৃদ্ধি বিলম্বিত ও দূর্বল হয় এবং ছাতক পোকামাকড় আক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সবল ও সতেজ চারা পাওয়ার জন্য নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করা উচিত। নার্সারিতে আগাছা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার করা উচিত।

৫.১.৪ চারা শ্রেণীকরণ

নার্সারিতে উভ্রেলিত চারাসমূহ সর্টিং করতে হবে। সর্টিং করার সময় বড় ও ছোট চারা ক্রমান্বয়ে সাজাতে হবে। তাহলে চারা সম্ভাবে আলো বাতাস পাবে এবং সবলভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। শিকড় পলিব্যাগ ভেদ করে মাটিতে গেলেও সর্টিং করা চারার শিকড়ের বৃদ্ধি রোধ পাবে এবং চারা নড়াচড়া করলে চারার শরীর শক্ত হবে।

নিম্নলিখিতভাবে চারা সর্টিং বা বাছাই করা যায়

- চারার উচ্চতা অনুযায়ী সর্টিং করতে হবে, যেন লম্বা চারার ছায়া বেটে চারায় না পরে।
- সমউচ্চতার চারা একসঙ্গে রেখেও সর্টিং করা যায়।
- দ্রুতবর্ধনশীল প্রজাতির চারা ২-৩ সপ্তাহ পর পর সর্টিং করতে হবে এবং ধীর বর্ধনশীল প্রজাতির চারা ২-৩ মাস পরপর সর্টিং করতে হবে।
- অনুপযোগী বিবেচনায় পৃথককৃত চারা নার্সারির একপাশে রেখে দিতে হবে এবং এ চারা বাগানে রোপণ করা যাবে না।

৫.১.৫ মূল ছাঁটাই

পলিব্যাগের চারায় ব্যাগে সরাসরি অক্সিরোদগম কিংবা পলিব্যাগের দ্রগ পরিপুষ্ট হওয়ার পর থেকেই পলিব্যাগের তলার দিকে কিংবা পাশের পানি নিষ্কাশন ছিদ্রের দিকে মূলের বৃদ্ধি শুরু হয়। যথাসময়ে এসব মূলকে ছাঁটাই করা উচিত। অন্যথায়, নার্সারি বীজতলাতেই চারা গাছের মূলের বিস্তার ঘটবে এবং চারা স্থানান্তরে অসুবিধা হয়।

৫.১.৬ মূক্তমূল ও মৃত্তিকা বিশিষ্ট চারা

মূক্তমূল অথবা মৃত্তিকা বল বিশিষ্ট চারার জন্য মূল ছাঁটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব চারা রোপনের জন্য মাটি থেকেই উঠাতে হবে। লম্বা প্রধান মূল এবং ব্যাপকসংখ্যক শাখামূল বিশিষ্ট চারার বেলায় চারা উঠানোর পর তা টিকে নাও থাকতে পারে। চারাগুলি শক্তিশালী হওয়া উচিত এবং ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে মূলকে সীমিত রাখা উচিত।

- মূল ছাঁটাইয়ের আগে বীজতলায় সমানভাবে পানি দিতে হবে এবং শোধনের জন্য পানি রেখে দিতে হবে,
- প্রধান মূল ছাঁটাইয়ের জন্য চারার গোড়া থেকে ১০-১৫ সে.মি. দূরে এবং প্রায় ৪৫ ডিগ্রী কোণে খৃতি/খন্তা ঢুকিয়ে দিতে হবে, ও
- পার্শ্বসহ মূল কাটার জন্য চারা গাছের উভয় পার্শ্বে ৫-৮ সে.মি. দূরে এবং ১০-১৫ সে.মি. গভীর লম্বালম্বিভাবে বেলচা ঢুকিয়ে দিতে হবে।

৫.১.৭ মাটি আলগাকৰণ

পলিব্যাগ কিংবা বীজতলার মাটি শক্ত হয়ে গেলে চারা গাছের মূলের বৃক্ষি এবং উন্নয়নের জন্য বায়ু চলাচলের সুবিধার্থে মাটি আলগা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আগাছা পরিকার করার সময়েই মাটি আলগা করা যেতে পারে অথবা অন্য যে কোন সময়ে বাঁশ বা কাঠের সূচালো কাঠি কিংবা নিড়ানী ব্যবহার করেও মাটি আলগা করা যেতে পারে।

৫.১.৮ সার প্রয়োগ

নাসাৰিতে ব্যাগে বা বেডের মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ জৈবসার থাকলে রাসায়নিক সার না দেওয়াই উভয়। তবে চারার যথাযথ বৃক্ষি না হলে, পাতা হলুদ বা ফ্যাকাশে রং ধারণ করলে ইউরিয়া, টিএসপি ও মিউরেট অব পটাশ পানিতে গুলিয়ে ঝর্ণা দ্বারা প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এ পদ্ধতিতে সার দেওয়ার পরপর অবশ্যই চারার উপর হালকা সেচ দিয়ে পাতা ধূয়ে দিতে হবে।

সারের মাত্রা: ১০ লিটার পানিতে ১০০ থাম ইউরিয়া, ২৫ থাম টি.এস.পি ও ৫০ থাম মিউরেট অব পটাশ ৪৫ দিন বয়সের চারায় প্রথম ও তিন মাস অন্তর ঝর্ণা দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৫.১.৯ রোগবালাই দমন

নাসাৰির চারায় ছ্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পোকামাকড়ের আক্রমণজনিত বিভিন্ন প্রকারের রোগব্যাধি হতে পারে। রোগের মধ্যে ড্যাম্পিং অফ বা মূল পঁচা রোগ, উইল্ট রোগ, পাতার দাগ পড়া রোগ ইত্যাদি বেশী পরিলক্ষিত হয়। এসব রোগ দমনে কুপ্রাতিট, ডায়াথিন এম-৪৫, রিডেমিল, বোর্দেমিক্সার ইত্যাদির ব্যবহার করতে হয়।

পোকামাকড়ের মধ্যে পাতার রস শোষক পোকা, পাতাভোজী পোকা, পাতা গুটানো পোকা, মাজরা পোকা, উড়চুঁগা, উই, পিপড়া ইত্যাদি প্রধান। এসব পোকা দমনের জন্য মেলথিয়ন, ডায়াজিন, সেভিন, লিনডেন, ডায়ালজ্ঞিন-২০ ইসি ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

৫.২ নাসাৰি ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বা রেকৰ্ড সংরক্ষণ

একটি নাসাৰি সফলভাবে পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা একান্তই প্রয়োজন। নাসাৰি স্থাপনের পূর্বেই সম্ভাব্যতা যাচাইসহ কিভাবে নাসাৰি পরিচালনা করা হবে সে বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। বীজ সংগ্রহ হতে শুরু করে পট বা ব্যাগ বা সীড় বেড তৈরী, জিনিসপত্র ত্রয় ইত্যাদি পরিকল্পনা মাফিক করতে হবে। বছরের কোন সময় কি কি কাজ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে আগে ভাগেই সিদ্ধান্ত ও তদ্বিষয়ে নথিপত্রে রেকৰ্ড রাখতে হবে। নাসাৰি জার্নাল, বীজ সংগ্রহ রেজিস্টার, বীজ বপন, বীজতলার কার্যক্রমের দৈনন্দিন কার্যবলীসহ চারা বিক্রয় বা বিতরণ রেজিস্টার প্রভৃতি নিয়মিত রেকৰ্ডভূক্ত করতে হবে।

৫.২.১. নাসাৰি জার্নাল

নাসাৰি জার্নালে মূলত বীজ সংগ্রহ ও চারা উত্তোলনের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি আদর্শ নাসাৰি জার্নালের জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

ক. নামারি পরিচিতি

১. নামারি, মালিকের নাম ও ঠিকানা:
২. নামারি প্রতিষ্ঠার বছর আয়তন
৩. ইউনিয়ন থানা জেলা

খ. নামারিতে উত্তোলিত চারার তথ্য

১. বিভিন্ন প্রজাতির বীজ সংগ্রহের তারিখ ও বীজের পরিমাণ:
২. বীজ বপনের জন্য পট বা ব্যাগ ক্রয়, সাইজ ও সংখ্যা, তারিখ:
৩. মাটি, বালি, গোবর ক্রয়/সংগ্রহের পরিমাণ ও তারিখ:
৪. নামারি বেডের সংখ্যা ও সাইজ:
৫. বীজ সংগ্রহের উৎস:
৬. বীজ সংরক্ষণের পূর্বে বা ব্যাগে বা বেডে বপনের পূর্বে বীজ শোধন করা হয়েছে কিনা?
৭. বীজ বপন এবং অঙ্কুরোদগমের বিস্তারিত তথ্য:

প্রজাতির নাম	বীজ বপনের তারিখ	পট/ব্যাগ/ বেডে বপনকৃত বীজের সংখ্যা	অঙ্কুরোদগমের তারিখ	অঙ্কুরোদগমের হার	মন্তব্য
১।					
২।					

৮. চারা সমূহ শ্রেণীকরণ করা, বাছাই করার তারিখ সমূহ:
৯. ছায়া প্রদান সহ অন্যান্য কোন ট্রিটমেন্ট দিলে তার বিবরণ:
১০. চারার মৃত্যু/পোকা মাকড় আক্রমণ করলে তার বিবরণ:
১১. নির্দিষ্ট সময়ে চারার গড় উচ্চতা:
১২. চারা উত্তোলনের অন্যান্য পদ্ধতি যদি থাকে-
 - সরাসরি ব্যাগে বীজ বপন
 - বীজ ট্রেতে বীজ বপন/চারা প্রিকিৎ আউট তারিখ
 - বেডে নগু শিকড় চারা উত্তোলন
 - অঙ্গ/রুট ট্রেইনার /ক্লোন পদ্ধতিতে যদি চারা উৎপন্ন হয় তবে তার বিবরণ:
১৩. অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি
১৪. নামারি ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬. কয়েকটি বিপন্নপ্রায় বৃক্ষপ্রজাতির পরিচিতি ও চারা উত্তোলন পদ্ধতি

১. খয়ের - *Acacia catechu*

বর্ণনা: মাঝারি আকৃতির পাতা ঝরা বৃক্ষ। ছাল অমসৃণ, গাঢ় ধূসর বাদামী রংয়ের। ডালে কাঁটা থাকে। ফুল হালকা হলুদ। ফল শিম, পড় জাতীয়। গাছের উচ্চতা ৮ - ১০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।

প্রাণিস্থান: দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে রাজশাহী জেলায় চারঘাট অঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: ডিসেম্বর - জানুয়ারি।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: গাছ হতে ধূসর অথবা বাদামী রংয়ের পড় বা ফল পাড়তে হবে। ফল সংগ্রহের পর সেগুলোকে রোদে শুকাতে হয়। ৩ - ৪ দিন শুকানোর পর ফল ফাটিতে শুরু করলে তা লাঠি বা অন্য কিছুর সাহায্যে মৃদু আঘাতের মাধ্যমে বীজ সংগ্রহ করা যায়। প্রতি পড়ে ৩ - ৪ টি করে বীজ থাকে। বীজ ভালো করে রোদে শুকিয়ে শুকনো জায়গায় গুদামজাত করে রাখা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ - ২২,০০০।

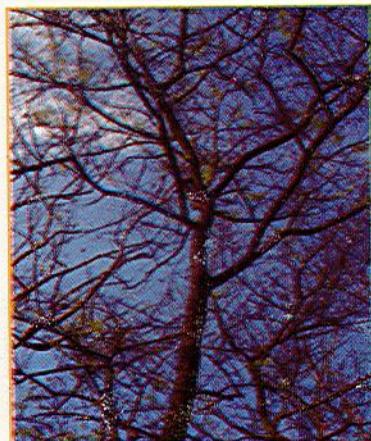
বীজ ব্যবহার পদ্ধতি: বীজ ব্যবহারের আগে অন্যান্য শিম জাতীয় গাছের বীজের মতো বীজের শোধন করা প্রয়োজন। সাধারণত: বীজ ব্যবহারের পূর্বে ২৪ ঘন্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে পরে বেড় বা পলিব্যাগে লাগানো যায়, অথবা গরম পানিতে (৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) ৩০ সেকেন্ড ছুবিয়ে রেখে ১২ ঘন্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখা যায়। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৮০- ৯০ ভাগ এবং অঙ্কুরোদগম হতে ১০ - ২০ দিন সময় লাগে।



ছবি - ২০.১: খয়ের ফল ও বীজ



ছবি - ২০.২: খয়ের চারা



ছবি - ২০.৩: খয়ের গাছ

চারা রূপণ পদ্ধতি: ৩ - ৪ মাস বয়সের চারা জুন জুলাই মাসে থালিতে লাগানো যায়। অনেক সময় শোধনকৃত বীজ সরাসরি থালি বা গর্তে ও লাগানো যায়।

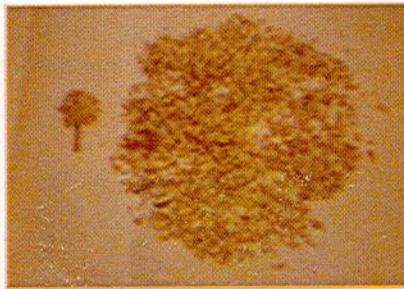
২. হলদু, কাইকা - *Adina cordifolia*

বর্ণনা: ৩০ - ৪০ মি. উচ্চ পাতা ঝরা বড় আকারের বৃক্ষ। বাকল ধূসর বর্ণের ও অমসৃণ। পাতা হৃদপিণ্ডাকার, বোটা লম্বা। ফুল গোলাকার মঞ্জুরীতে বিন্যস্ত।

প্রাণিস্থান: টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের শাল বন, চট্টগ্রাম ও সিলেটের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: ফেব্রুয়ারি - মার্চ।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বপন: ফল অসংখ্য ছোট ক্যাপসুলের সমষ্টি। পরিপক্ষ গোলাকার ফলসমূহ কালচে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে গাছ হতে সংগ্রহ করতে হয়। হালকা রোদে ফলগুলো শুকানোর পর ছাঢ়ি বা লাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে পিটিয়ে ভেঙে গুଡ়া করতে হয়। খুবই সূক্ষ্ম বীজ ফলের তুষের (আবর্জনা, তথ্যাংশ) সাথে মিশে থাকে বিধায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বীজ পরিকার করে বায়ু নিরোধক পাত্রে সংরক্ষণ করা যায়। বীজ সাধারণত: অক্তুরোদগম ট্রেতে বা সরাসরি বেড়ে বপন করা উচ্চ, এতে বীজের অপচয় কর হয়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১২ - ১৩ লক্ষ। অক্তুরোদগমের সময়কাল ১৫ - ২৫ দিন এবং অক্তুরোদগমের হার শতকরা ৪০ - ৫০ ভাগ।



ছবি - ২১.১: হলদু ফল ও বীজ



ছবি - ২১.৩: হলদু গাছ



ছবি - ২১.২: হলদু চারা

চারা রোপণ পদ্ধতি: বর্ষার প্রারম্ভে জুন-জুলাই মাসে এক বছর বয়সী চারা লাগানো যায়।

৩. ছাতিয়ান - *Alstonia scholaris*

বর্ণনা: ১০ - ১৫ মিটার উচু মাঝারি হতে বৃহৎ চিরহরিৎ বৃক্ষ। বাকল অমসৃণ ও ধূসর বর্ণের। শাখা মূল কাণ্ডের সাথে চক্রাকারে সাজানো থাকে। প্রায় সব শাখারই অগ্রভাগ ছত্রাকার ও ৭টি পাতা সাজানো থাকে, পাতা খসখসে। ফুল ছোট সরুজাত, ফল সাদা, সরু, গোলাকৃতি, বরবটি শিমের মত ও গুচ্ছভাবে ঝোলানো থাকে।

প্রাপ্তিস্থান: পার্বত্য এলাকায় বনাঞ্চল ও শালবন এলাকায় বিশিষ্টভাবে পাওয়া যায়। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে সড়কের পাশে লাগানো গাছ ও দেখা যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: মার্চ - এপ্রিল

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: লম্বা সরু বাদামী রঙের পড় বা ফল ডাল সমেত গাছ থেকে সংগ্রহ করে ২ - ৩ দিন কাপড় দিয়ে ঢেকে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে বন্ধবরে আন্তে আন্তে মাড়াই করে খোসা থেকে বীজ আলাদা করে নিতে হয়। বীজ শুকনো জায়গায় ৩ - ৪ মাস সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি কেজিতে ২,৫০,০০০ - ২,৮০,০০০ টি বীজ থাকে।

বীজ বপন পদ্ধতি: বীজ খুব বেশি হাঙ্কা হওয়ায় কাঠের গুড়া বা বালির সঙ্গে মিশিয়ে বীজ তলায় বা বীজ অঙ্কুরোদগম ট্রেতে বপন করা যায়। নার্সারি বেডে হালকা ছায়া ও নিয়মিত পানি দেওয়া প্রয়োজন। ১২ - ১৫ দিনের মধ্যে বীজ গজানো শুরু হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় বীজ গজানোর হার শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ।



ছবি - ২২.১ ছাতিয়ান ফল ও বীজ



ছবি - ২২.২ ছাতিয়ান চারা



ছবি - ২২.৩ ছাতিয়ান ফুল



ছবি - ২২.৪ ছাতিয়ান গাছ

চারা রোপণ পদ্ধতি: ৩ - ৪ মাস বয়সের চারা জুন - জুলাই মাসে লাগানো যায়, তবে ১ বৎসর বয়সী চারা লাগানোই উত্তম।

৪. বৈলাম - *Anisoptera scaphula*

বর্ণনা: ৩০ - ৪০ মি. উচু বৃহৎ আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। কাণ্ড সোজা, সরল, লম্বা এবং মাঝের বেড় ৫ মিটার পর্যন্ত হয়। পাতা লম্বাটে, ১০ - ১৭ সে. মি. লম্বা। সাদা ফুল শাখাওভিত কক্ষ মণ্ডুরীতে বিন্যস্ত। ফল পক্ষল নাট জাতীয়, পাখনা দুইটি ফলের শীর্ষদেশে অবস্থিত।

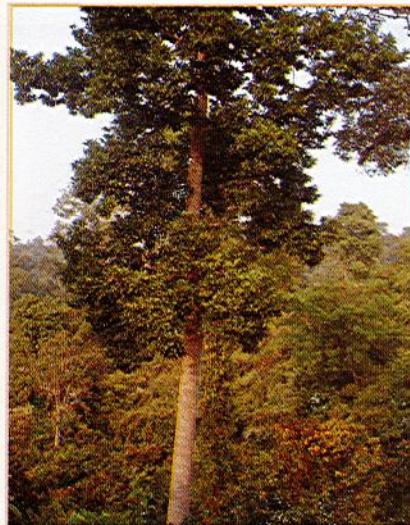
প্রাণিস্থান: বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, কর্কুবাজার ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: মে - জুন।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বপন পদ্ধতি: প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১০০ - ১৫০ টির মতো। বীজ সংগ্রহের ২/১ দিনের মধ্যে বপন করা উচিত, অন্যথায় বীজের অঙ্গুরোদগমের হার কমতে থাকে। বীজ অঙ্গুরোদগমের সময়কাল ৫-৭ দিন এবং অঙ্গুরোদগমের হার শতকরা ৭০ - ৮০ ভাগ এর বেশী।



ছবি - ২৩.১: বৈলাম বীজ



ছবি - ২৩.৩: বৈলাম গাছ



ছবি - ২৩.২: বৈলাম চারা

চারা রোপণ পদ্ধতি: বর্ষার প্রারম্ভে জুন - জুলাই মাসে এক বছর বয়সী চারা লাগানো যায়।

৫. পিতরাজ, রয়না - *Aphanamixis polystachya*

বর্ণনা: মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। বাকল ধূসর, সাদা ও খোসাযুক্ত। ফুল ছোট লম্বা মঞ্জুরীতে বিন্যস্ত। ফল গোলাকার। বীজ চকচকে কালচে বর্ণের।

প্রাণিস্থান: বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়, তবে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম বনাঞ্চলে বেশী দেখা যায়।

বীজ সংরক্ষণের সময়: মার্চ - এপ্রিল।

বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ ব্যবহার পদ্ধতি: কেজিতে ১১০০ - ১২০০ টি বীজ পাওয়া যায়। বীজ সরাসরি পট বা ব্যাগে ব্যবহার করা যায়। অঙ্কুরোদগম কাল ২০ - ২৫ দিন এবং অঙ্কুরোদগম হার শতকরা ৫০ - ৬০ ভাগ।



ছবি - ২৪.১: পিতরাজ ফল ও বীজ



ছবি - ২৪.২: পিতরাজ চারা



ছবি - ২৪.৩: পিতরাজ গাছ

চারা রোপণ পদ্ধতি: বর্ষার প্রারম্ভে জুন - জুলাই মাসে এক বছর বয়সী চারা লাগানো যায়।

৬. আগর - *Aquilaria agallocha*

বর্ণনা: আগর ১৫ - ২০ মিটার উচু একটি চির সরুজ বৃক্ষ। পাতা শাখার উভয় দিকে যুগ্মভাবে জন্মে। ফুল সাদা, খুব ছোট ও ফল ডিম্বাকৃতির।

প্রাণিস্থান: পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চলে জন্মে। শ্রীমঙ্গল ও মৌলভীবাজারে অনেক উত্তোলিত আগর বাগান আছে। বন বিভাগের আগর বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কর্বিবাজার বনাঞ্চলে ও বাগান উত্তোলন করা হয়েছে।

বীজ সংগ্রহের সময়: জুলাই-আগস্ট।

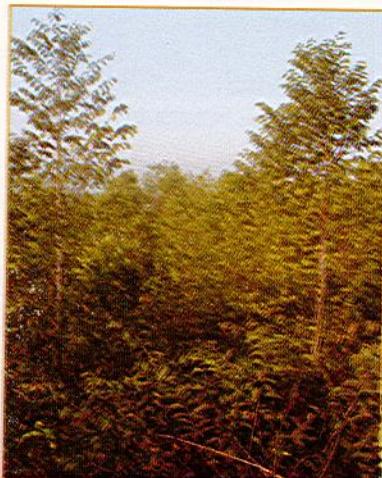
বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ ব্যবহার পদ্ধতি: ফেব্রুয়ারি - মার্চ মাসে ফুল হয় এবং জুন-জুলাই মাসে ফল পরিপন্থ হয়। ফল দেখতে কিছুট ডিম্বাকৃতির এবং প্রতি ফলে ২টি বীজ পাওয়া যায়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা প্রায় ১১০০ টি। ফল থেকে বীজ সংগ্রহের পরপরই ব্যবহার করতে হয় কেননা আগর বীজ ৫ - ৭ দিনের বেশী সংরক্ষণ করা যায়না। বীজ ব্যবহারে এক সংগ্রহের মধ্যে অঙ্কুরদণ্ড শুরু হয় এবং এক মাসের মধ্যে শেষ হয়।



ছবি - ২৫.১: আগর ফল ও বীজ



ছবি - ২৫.২: আগর চারা



ছবি - ২৫.৩: আগর বাগান

চারা রোপণ পদ্ধতি: বন্যামুক্ত ঢালু পাহাড়ী জমি আগর বনায়নের জন্য উপযুক্ত। ২ - ৩ মিটার দূরত্বে আগর চারা লাগানো হয়। সাধারণত: ১০ - ১২ মাস বয়সী ৫০ সে. মি. উচ্চতা সম্পন্ন চারা লাগানোই উত্তম।

৭. চাপালিশ - *Artocarpus chama* (*A. chaplasha*)

বর্ণনা: ২৫-৩০ মিটার উচু বৃহৎ আকারের বৃক্ষ। তবে সাধারণত চিরসবুজ কিন্তু অনেক সময় শুকনা অঞ্চলে জন্মানো গাছের পাতা ঘরে পড়ে। বয়স্ক উচু বৃক্ষের বেড ৫ - ৭ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফল অনেকটা ছোট কাঠালের মতো, গোলাকার। পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও মধ্যপুর শালবন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: জুন- জুলাই।

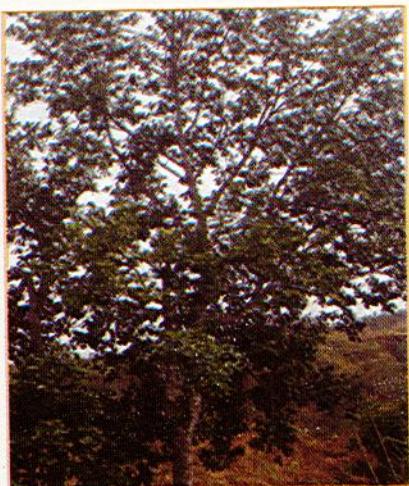
বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ ব্যবহার পদ্ধতি: চাপালিশ ফল পাকলে হলুদ রং ধারণ করে। ফল স্ক্রুপাকারে ৫ - ৬ দিন রাখলে পাঁচে যায়। তখন গামলা বা বালতিতে নিয়ে ভালভাবে ধূয়ে ফল হতে বীজ আলাদা করা যায়। ফল থেকে বীজ আলাদা করার পরপরই সরাসরি পলিব্যাগে ব্যবহার করা উচিত, কেননা চাপালিশ বীজ ব্যবহারে দেরী হলে বীজের অঙ্কুরোদগমের হার কমতে থাকে। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৪০০ - ৫০০ টি। বীজ ব্যবহারে ৭ - ১৫ দিনের মধ্যে বীজ হতে চারা গজানো শুরু হয়। বীজ গজানোর হার শতকরা ৭০ - ৮০ ভাগ। বীজ তলায় সেঁচ দেওয়া উত্তম।



ছবি - ২৬.১: চাপালিশ ফল ও বীজ



ছবি - ২৬.২: চাপালিশ চারা



ছবি - ২৬.৩: চাপালিশ গাছ

চারা রোপণ পদ্ধতি: সাধারণত: ১০ - ১২ মাস বয়সের চারা পরবর্তী বছরে থালি করে লাগানো যায়। বন বিভাগ ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা রোপণ করে থাকে।

৮. বরতা, টেওয়া - *Artocarpus lacucha*

বর্ণনা: ১২ - ১৫ মিটার উচু পাতা ঝরা বৃক্ষ। পাতা সরল, একান্তর। ফলের বেড ৫ - ১০ সে. মি. অনেকটা খাজ ও ভাজে অসমান।

আণ্ডিস্থান: প্রাকৃতিক বনাঞ্চলসহ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: মে - জুলাই।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ ব্যবহারের পদ্ধতি: ফল ৫ - ১০ সে. মি. ব্যাসার্ধের হলুদ বর্ণের, অসমান ও সাইনোকার্প জাতীয়। বীজ নার্সারি বেডে বা পলিব্যাগে সরাসরি রোপন করা যায়। বীজের অংকুরোদগম কাল ১৮ - ২০ দিন এবং বীজের অংকুরোদগমের হার ৭০% এর অধিক। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৫০০ - ৭০০।



ছবি - ২৭.১: বরতা ফল ও বীজ



ছবি - ২৭.২: বরতা চারা



ছবি - ২৭.৩: বরতা গাছ

চারা রোপণ পদ্ধতি: সাধারণত: ১০ - ১২ মাস বয়সের চারা ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে থালি করে লাগানো যায়।

৯. হিজল - *Barringtonia acutangula*

বর্ণনা: মধ্যম আকৃতির চিরহরিৎ বৃক্ষ, উচ্চতায় অব বর্ষাকৃতির, ৭ - ১৫ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। বাকল ঘন ছাই রঙের। পাতা সরল, একান্তর, পল্লবের শীর্ষদেশ ঘনভাবে বিন্যস্ত ফুল হালকা লাল। লম্বা ঝুলন্ত মঞ্জুরীতে সজিত।

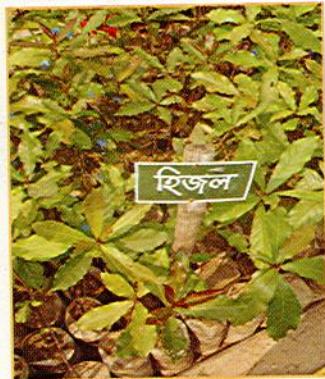
প্রাণিস্থান: বাংলাদেশের সকল হাওর এলাকায় বা নীচু জলাবদ্ধ এলাকার তীর ভূমিতে জন্মে।

বীজ সংগ্রহের সময়: আগস্ট- সেপ্টেম্বর।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, বীজ বপন ও সংরক্ষণ: ফল আয়ত চতুর্কোন বিশিষ্ট, ২.৫ সে. মি. চওড়া ও মাংসল। পরিপক্ষ ফল গাছ থেকে ও সংগ্রহ করা যায় বা ফল পাকার পর মাটিতে পড়ে গেলে মাটি থেকেও সংগ্রহ করা যায়। ছায়াযুক্ত স্থানে ফল শুকিয়ে ৪ - ৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়, তবে সংগ্রহের সাথে সাথে বীজ বপন উত্তম। প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ প্রায় ২০০০ - ২১০০ টি। বীজ নার্সারি বেড়ে বা পলিব্যাগে সরাসরি রোপণ করা যায়। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৯০ - ৯৫ ভাগ এবং অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হতে সময় লাগে ১৫ - ২০ দিন। অনেক সময় গাছের নীচে বীজ পড়ে চারা গজায়, যা সংগ্রহ করে ও লাগানো যায়।



ছবি - ২৮.১: হিজল ফল



ছবি - ২৮.২: হিজল চারা



ছবি - ২৮.৩: হিজল গাছ

চারা রোপণ পদ্ধতি: বর্ষার প্রারম্ভে জুন - জুলাই মাসে এক বছর বয়সী চারা লাগানোই উত্তম।

১০. কাইনজল, লটুবাদি - *Bischofia javanica*

বর্ণনা: বড় আকারের পত্রমোচী বৃক্ষ। বাকল ধূসর ও ভাজযুক্ত। কাণ্ড কাটলে লাল রং
এর রস বের হয়। লম্বা বোটার অগ্রভাগে তিনটি পত্রফলক বিন্যস্ত। ফল রসালো,
ডিম্বাকার ও ৩ - ৪ টি বীজযুক্ত।

প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল ছাড়াও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের
গ্রামাঞ্চলে কদাচিত্ত জম্মাতে দেখা যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: ডিসেম্বর - জানুয়ারি।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, বীজ বপন ও সংরক্ষণ: পাকার পর ফলগুলো লাল বর্ণ ধারন
করে এবং গাছ থেকে সংগ্রহ করে ফলগুলোকে ছায়াতে স্তূপাকার করে কয়েকদিন
রেখে দিতে হয়। ফল পচা শুরু হলে নরম ফলত্বক পানিতে ধূয়ে বীজ আলগা করে
নিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হয়। বীজ সংরক্ষণ করা যায়না বলে যথাশীত্ব বীজ বপন
করা ভাল। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৯২,০০০ - ১০০,০০০ টি। বীজ নাস্রারি
বেড়ে বা পলিব্যাগে সরাসরি রোপন করা যায়। অঙ্কুরোদগম সময়কাল ৭ - ১০ দিন
এবং অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৬০-৭০ ভাগ।



ছবি - ২৯.১: কাইনজল ফল



ছবি - ২৯.২: কাইনজল গাছ

চারা রোপণ পদ্ধতি: বর্ষার প্রারম্ভে জুন - জুলাই মাসে এক বছর বয়সী চারা লাগানোই
উত্তম।

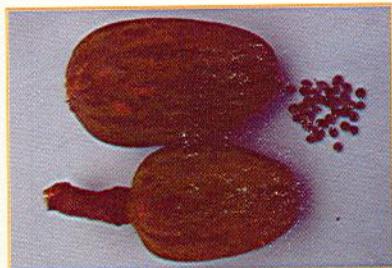
১১. শিমুল - *Bombax ceiba*

বর্ণনা: ৩০ - ৪০ মিটার উচু পাতা ঝরা বৃক্ষ, গাছের কাণ্ড গোল, ডালপালা বৃত্তাকারে বিস্তৃত। বৃক্ষের কাণ্ডে ও শাখায় বড় বড় কাঁটা থাকে। ফুল বেশ উজ্জ্বল ও লাল বর্ণের।

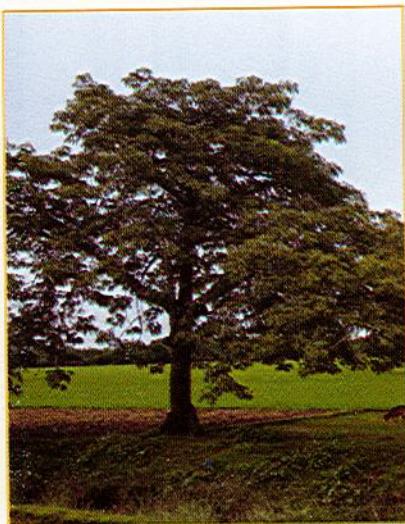
প্রাণিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই শিমুল গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: এপ্রিল - মে।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: ফল সম্পূর্ণ পাকার পূর্বে সংগ্রহ করে নিতে হবে কেননা পাকা ফল গাছেই ফেটে যায়। সংগৃহীত ফলগুলোকে হালকা আবরণ বা পুরানো মশারী দিয়ে ঢেকে রোদে শুকাতে হবে। ফল ফাটলে তা থেকে তুলা আলাদা করে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ রোদে শুকিয়ে বায়ু নিরোধক পাত্রে ১ - ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ ২৫,০০০ - ২৬,০০০ পর্যন্ত হয়।



ছবি - ৩০.১: শিমুল ফল ও বীজ



ছবি - ৩০.২: শিমুল গাছ



ছবি - ৩০.১: শিমুল চারা

বীজ বপন: এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের প্রথমার্ধে নর্সারি বেডে বা পলিব্যাগে বীজ সরাসরি বপন করা যায়। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৭০ - ৭৫ ভাগ এবং ১৫ - ২০ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয়।

চারা রোপণ পদ্ধতি: সাধারণত: এক বছর বয়সের চারা লাগানোই উত্তম। স্টাম্প পদ্ধতি বা ডালের কলমের মাধ্যমেও এর বৃশ্চ বিস্তার করা যায়।

১২. পলাশ - *Butea monosperma*

বর্ণনা: ৮-১০ মিটার উচু মাঝারি আকৃতির পাতা ঘরা বৃক্ষ। কাণ্ড আঁকা, বাকল মোটা, অমসৃণ ও ছাই বর্ণের। পাতা যৌগিক, পত্রফলক তিনটি ডিম্বাকৃতি হতে লম্বা আকৃতির। ফুল হালকা লাল থেকে হলুদাভ লাল।

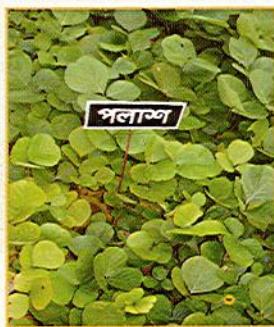
প্রাণিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। পলাশ শাল বনের একটি প্রধান সহযোগী প্রজাতি।

বীজ সংগ্রহের সময়: মে - জুন।

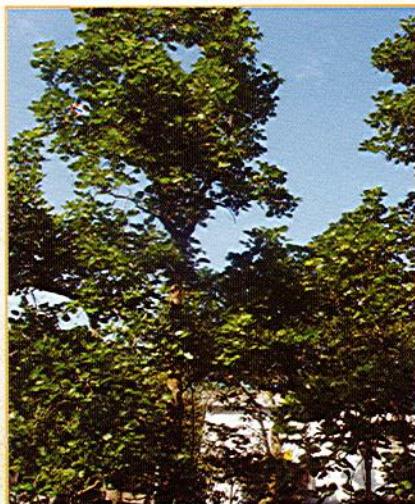
বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: মে জুন মাসে সরুজ বর্ণের পরিপক্ষ শিম রোদে দিলে ফেটে বীজ বের হয়। প্রতি কেজিতে প্রায় ৬০০ - ৮০০ বীজ হয়। বীজ প্রায় ৭ - ১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।



ছবি - ৩১.১: পলাশ ফল ও বীজ



ছবি - ৩১.২: পলাশ চারা



ছবি - ৩১.৩: পলাশ গাছ

বীজ বপন: বীজ নার্সারি বেডে বা পলিব্যাগে সরাসরি লাগানো যায়। টাটকা বীজে অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৫০ - ৬০ ভাগ। পুরানো বীজের অঙ্কুরোদগম সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে ২০ দিনের মতো।

চারা রোপণ: সরাসরি থালিতে বীজ বপন করে বা নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করে জুন - জুলাই মাসে চারা লাগানো যায়।

১৩. পূন্নাল, পনিয়াল- *Calophyllum inophyllum*

বর্ণনা: ১২ - ১৫ মিটার উচু মধ্যম আকৃতির চির সবুজ বৃক্ষ। গাছের গুড়ি মোটা ও প্রায়শই আঁকা বাঁকা। পাতা সরল, উপবৃত্তাকার, ১০ - ১২ সে. মি. লম্বা, ফুল সাদা। ফল গোলাকৃতি, তেলযুক্ত।

প্রাণিস্থান: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিশ্বিষ্টভাবে বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: ডিসেম্বর - জানুয়ারি।

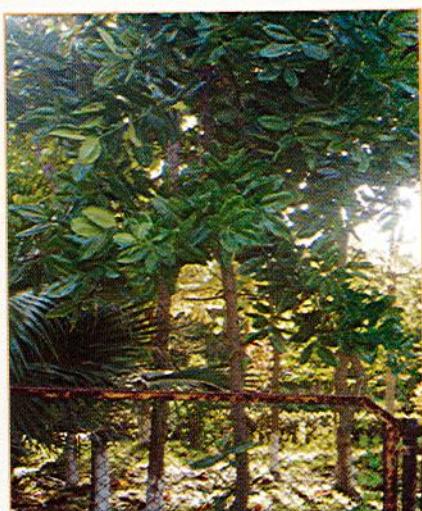
বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বপন: ফল হলুদ রং ধারণ করলে গাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়। তৈলাক্ত বীজ বিধায় সংগ্রহ করার সাথে সাথে বীজ বপন করতে হবে। প্রতি কেজিতে ২৫০ - ৩০০ টি ফল বা বীজ হয়। বীজ সংগ্রহের সাথে সাথে বেড়ে বা পলিব্যাগে বপন করতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগম হতে সময় লাগে প্রায় ২৫ - ৩০ দিন।



ছবি - ৩২.১: পূন্নাল ফল ও বীজ



ছবি - ৩২.২: পূন্নাল চারা



ছবি - ৩২.৩: পূন্নাল গাছ

চারা রোপণ: এক বছর বয়সের চারা লাগানোই উত্তম।

১৪. সোনালু - *Cassia fistula*

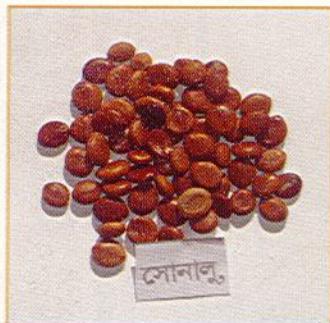
বর্ণনা: মধ্যম আকৃতির ১২ - ১৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট পাতা ঝরা বৃক্ষ। ফুল হলুদ, সোনালী বর্ণের। ফল পড়, গোলাকার লম্বাদণ্ডের মত যা অনেকের কাছে বাঁদর লাঠি হিসাবে সমধিক পরিচিত।

প্রাণিস্থান: দেশের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়, তবে ইদানীং গাছের সংখ্যা কমে গেছে।

বীজ সংগ্রহের সময়: নভেম্বর - মার্চ।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: গাছ থেকে পরিপক্ব লাঠি আকৃতির ফল সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। পরে ফল ভেঙ্গে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করে রোদে শুকাতে হবে। শুকনো স্থানে সাধারণ তাপমাত্রায় বীজ অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৬,০০০ - ৭,০০০ টি পর্যন্ত হয়।

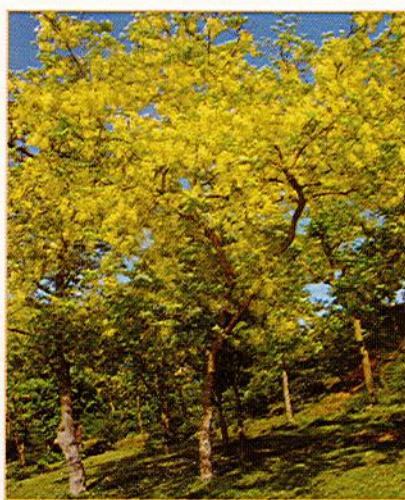
বীজ বপন পদ্ধতি: মার্চ এপ্রিল মাসে বীজ সংগ্রহের পর বীজ সরাসরি বেড়ে বা পলিব্যাগে বপন করতে হবে। অন্যান্য শিম জাতীয় বীজের মতো সোনালু বীজকে ১ মিনিট গরম পানিতে রেখে পরবর্তী ১২ ঘন্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৫০ - ৬০ ভাগ এবং ২০ - ৩০ দিনের মধ্যেই বীজের অঙ্কুরোদগম শেষ হয়।



ছবি - ৩৩.১: সোনালু বীজ



ছবি - ৩৩.২: সোনালু চারা



ছবি - ৩৩.৩: সোনালু গাছ

চারা রূপণ: মে - জুন মাসে চারা লাগানো যায়। এক বছর বয়সী চারা লাগানোই উত্তম।

১৫. বাটনা, শীল বাটনা - *Castanopsis indica*

বর্ণনা: ২০ - ২৫ মিটার উচ্চতার বড় আকারের চির সরুজ বৃক্ষ। পাতা সরল, লম্বাটে, ১২ - ২০ সে.মি. লম্বা, অগ্রভাগ দাঁত কাটা, ফল ২.৫ - ৩.০ সে.মি. হয়ে থাকে।

প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংরক্ষণের সময়: জুলাই - আগস্ট।

বীজ সংরক্ষণ : বীজ সরাসরি পট বা ব্যাগে বপন করা যায় এবং বীজ অঙ্কুরোদগমে ৩ - ৪ মাসের বেশী সময় লাগে। প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ ১,০০০ - ১,৩০০ টি।

বীজ বপন পদ্ধতি: বীজ সরাসরি পলিব্যাগে বা পটে বপন করা যায়।

বাটনা, শীল-বাটনা জাত বাটনা

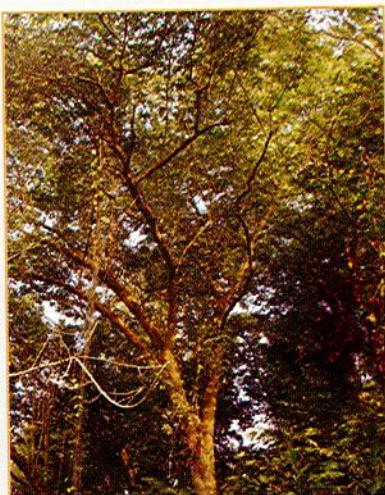


ছবি - ৩৪.১: বাটনা ফল



ছবি - ৩৪.২: বাটনা চারা

চারা রোপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।



ছবি - ৩৪.৩: বাটনা গাছ

১৬. চিকরাশি - *Chukrasia velutina*

বর্ণনা: বড় আকৃতির পত্রবারা বৃক্ষ, উচ্চতায় ২৫ মিটার ও বেড় ২.৫ মিটার পর্যন্ত হয়। পাতা যৌগিক, পত্রফলক ১০ - ২৪ টি, একান্তর নিচের দিকে তীর্যক। সাদা ফুল শাখান্বিত মঞ্জুরীতে বিন্যস্ত। ফল কাষ্ঠল, ক্যাপসুল।

প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, কক্ষবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। বন বিভাগও বেশ কিছু এলাকায় এ গাছ লাগিয়েছে।

বীজ সংগ্রহের সময়: জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: ফল গোলাকার, ৫ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০ - ৫০,০০০ টি। ফল গাছ হতে আহরণ করার পর ২/৩ দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। ফল লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ সমুহ আলাদা করে নিতে হয়। বীজ সংগ্রহের ৩ সপ্তাহের মধ্যে বপন করা উত্তম, অন্যথায় বীজ গজানোর হার কমে যাবে।



ছবি - ৩৫.১: চিকরাশি বীজ



ছবি - ৩৫.৩: চিকরাশি গাছ



ছবি - ৩৫.২: চিকরাশি চারা

বীজ বপন পদ্ধতি: বীজ ট্রেতে বা সরাসরি পটে বপন করা যায়। অঙ্কুরোদগম কাল ১০ - ১৫ দিন এবং অঙ্কুরোদগম হার শতকরা ৫০ - ৫৫ ভাগ।

চারা রোগন: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো হয়।

১৭. বরুনা, লাডুম, পিতাগুলা - *Crataeva magna*

বর্ণনা: মাঝারি আকারের পত্রবরা বৃক্ষ। বাকল মসৃণ, পাঢ় ছাই ও ধূসর বর্ণের। পাতা তিন ফলক বিশিষ্ট ঘোণিক, পত্রফলক তিনটি ৫ - ১০ সে. মি. লম্বা বৃত্তের অগ্রভাগে বিন্যস্ত। ফুল সাদা। ফল ডিয়াকার।

প্রাণিস্থান: কর্বাচার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের নিচু এলাকায় জন্মে। বাংলাদেশের সর্বত্রই নিচু জায়গায় এ গাছ দেখা যায়, তবে সিলেটের হাওর এলাকায় বেশী জন্মে।

বীজ সংগ্রহের সময়: জুলাই - সেপ্টেম্বর।

বীজ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ: ফল গাছ হতে আহরণ করার পর কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। ফল হতে বীজ সমুহ আলাদা করে নিতে হয়। বীজ সংগ্রহের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবহার করা উচ্চম, অন্যথায় বীজ গজানোর হার কমে যাবে। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ২০,০০০ - ২৫,০০০ টি।



ছবি - ৩৬.১: বরুনা ফল



ছবি - ৩৬.১: বরুনা চারা



ছবি - ৩৬.১: বরুনা গাছ

চারা রোপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়।

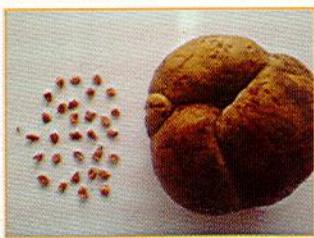
১৮. চালতা - *Dillenia indica*

বর্ণনা: মাঝারি আকৃতির চির সবুজ বৃক্ষ। উচ্চতায় ২০ - ২৫ মিটার ও ডালপালা বিস্তৃত থাকে। পাতা ঘন সারিবদ্ধ, পাতার কিনারা করাতের মত খাঁজ কাটা ও সমান্তরাল শিরাযুক্ত, পাতা লম্বায় ২৫ - ৩০ সে.মি. পর্যন্ত হয়। ফুল সাদা, বড় আকৃতির ও সুগন্ধযুক্ত। পাপড়ি মোটা। মে জুন মাসে ফোটে। চালতার যে অংশটা ফল হিসাবে ব্যবহার করা হয় সেগুলো ফুলের বৃত্তি। আসল ফল এই বৃত্তির ভেতরে থাকে। ফলের অভ্যন্তরে বীজ চকচকে আঠা দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

প্রাণিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই জন্মে। সাধারণত: ভেজা স্যাঁতস্যেঁতে এলাকায় ভাল জন্মে।

বীজ সংগ্রহের সময়: অক্টোবর - ডিসেম্বর।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: পাকা ফলের মধ্যে ২০টির মতো প্রকোষ্ঠ থাকে আর প্রতিটি প্রকোষ্ঠে ৪ - ৬ টি বীজ থাকে। বীজ স্বচ্ছ, আঠাযুক্ত ও হালকা হলুদাভ বর্ণের। ফল থেকে বীজ ছাড়িয়ে ২ - ৩ দিন রোদে শুকিয়ে বীজ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায়। ১ কেজিতে প্রায় ৫১,০০০ - ৫৩,০০০ বীজ পাওয়া যায়।



ছবি - ৩৭.১: চালতা ফল ও বীজ



ছবি - ৩৭.২: চালতা চারা



ছবি - ৩৭.৩: চালতা গাছ

বীজ ব্যবহার পদ্ধতি: পলিব্যাগে মার্চ - এপ্রিল মাসে প্রতি ব্যাগে ২টি করে বীজ ব্যবহার করতে হবে। ৮ - ১০ মাসে চারা রোপণ উপযোগী হয়। অনেক সময় গাছের নিচ থেকে ও চারা সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া ফল ছড়া বা খালের পানিতে আটকে গেলে সেখানেই বীজ গজাতে দেখা যায়। এছাড়া বন্য প্রাণীর বিষ্ঠার সাথে বীজ বেরিয়ে আসার পরও অঙ্কুরোদগম হতে দেখা যায়।

চারা রোপণ: এক বছর বয়সের চারা বর্ষার প্রারম্ভে রোপণ করতে হবে। সাধারণত: ভেজা স্যাঁতস্যেঁতে জায়গায় চালতা গাছ ভালো জন্মে। এই গাছ প্রচুর পরিমাণ আলো পছন্দ করে।

১৯. হারগাজা, আজুলি - *Dillenia pentagyna*

বর্ণনা: ১৫ - ২০ মি. উচু মধ্যমাকৃতির পাতা ঝারা বৃক্ষ। পাতা ঘন, সারিবদ্ধ, প্রান্ত খাজ কাটা হয়ে থাকে।

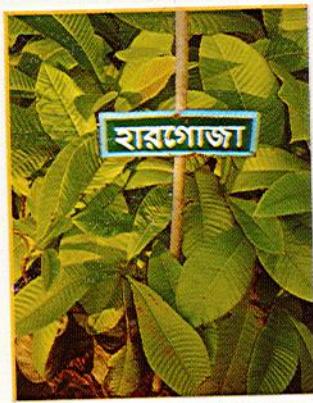
প্রাণিস্থান: কক্রবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: জুন - জুলাই।

বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার: ফল থেকে বীজ ছাড়িয়ে ২ - ৩ দিন রোদে শুকিয়ে বীজ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায়। বীজ সরাসরি পট বা ব্যাগে ব্যবহার করা যায় এবং অঙ্কুরোদগমের সময়কাল ৪৫ - ৬০ দিন। অঙ্কুরোদগমের হার প্রায় ৫০%। কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা ৩৭,০০০ - ৫১,০০০।



ছবি - ৩৮.১: হারগাজা ফল



ছবি - ৩৮.২: হারগাজা চারা



ছবি - ৩৮.৩: হারগাজা গাছ

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন-জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

২০. তেলি গর্জন - *Dipterocarpus turbinatus*

বর্ণনা: ৩০ - ৪০ মিটার উচ্চ বৃহদাকার চিরহরিৎ বৃক্ষ। কাণ্ড সরল, গোলাকার, বেশ উচ্চ পর্যন্ত শাখা প্রশাখা বিহীন চট্টগ্রাম বনাঞ্চলে এই বৃক্ষ তেলিয়া গর্জন নামে পরিচিত। গাছের বাকল হালকা ধূসর বর্ণের হয়। ফল ডিম্বাকার, মসৃণ, মাথার দিকে দুইটি পাখনা সংযুক্ত থাকে।

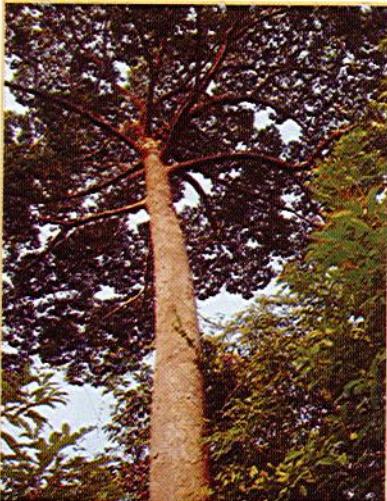
প্রাণিস্থান: সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।
বীজ সংগ্রহের সময়: মে - জুন

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: দুই পাখা বিশিষ্ট এই বীজ গাছের নীচ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। প্রতি কেজিতে প্রায় ১৫০ - ১৭০ টির মতো বীজ হয়। বীজের আয়ুক্ষাল খুবই স্বল্প বিধায় সংগ্রহ করার সাথে সাথে বীজ বপন করা প্রয়োজন।

বীজ বপন: বীজ সংগ্রহের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তা পলিব্যাগে বা নার্সারি বেডে রোপন করতে হবে। সদ্য সংগ্রহ করা বীজের অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৮০ ভাগ এবং ১০ - ১২ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয়।



ছবি - ৩৯.১: গর্জন বীজ



ছবি - ৩৯.৩: গর্জন গাছ



ছবি - ৩৯.২: গর্জন চারা

চারা রোপণ: প্রচুর পরিমাণ বীজ থাকিলে বীজ সরাসরি থালিতে বা লাইন করে গর্তে বপন করা যায়। এছাড়া পলিব্যাগে উত্তোলিত ১ বছর বয়সী চারা বর্ষার শুরুতেই লাগানো যেতে পারে।

২১. বান্দরহোলা - *Duabanga grandiflora*

বর্ণনা: ৩০ মিটার পর্যন্ত উচ্চ বড় আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ। পাতা সরল, ১৮ - ৩৫ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা। প্রতিমুখ, পল্লবে দুই সারিতে সজিত ফুল সাদা, বেশ বড়, বেশ কয়টি শাখা-পল্লবের অগ্রভাগে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। ফল চ্যাপ্টাকৃতির গোল।

প্রাণিস্থান: বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্রবাজার, সিলেট ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।
বীজ সংগ্রহের সময়: এপ্রিল - মে।

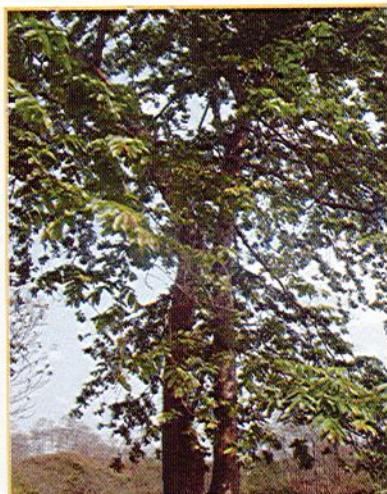
বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বপন: ফল ক্যাপসুল, ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। ফল পরিপক্ষ হলে কালচে আকার ধারণ করে। ২ - ৩ দিন ওকানোর পর ফল সমুহ কাপড়ের উপর রেখে আন্তে আন্তে লাঠির আঘাতে বীজ বের করা হয়। বীজ অতি ক্ষুদ্র। কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা আনুমানিক ২,৪০,০০,০০০ টি। বীজ বপনের ৪ - ৫ সপ্তাহের মধ্যে অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয় এবং অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ২৫ - ৩০ ভাগ।



ছবি - ৪০.১: বান্দরহোলা ফল



ছবি - ৪০.২: বান্দরহোলা চারা



ছবি - ৪০.৩: বান্দরহোলা গাছ

চারা রোপণ: ব্যাগে উত্তোলিত ১ বছর বয়সী চারা বর্ষার শুরুতেই লাগানো যেতে পারে।

২২. উদাল, উজাল - *Firmiana colorata* (*Sterculia colorata*)

বর্ণনা: ১৫ - ২০ মিটার উচু মধ্যমাকৃতির পত্রবরা বৃক্ষ। বাকল মসৃণ ও ধূসর বর্ণের। পাতা বেশ বড়, বোটা ১০ - ১৫ সে. মি. লম্বা, বোটার পত্রফলক ১০ - ২৫ সে. মি. লম্বা ও চওড়ায় প্রায় একই সমান ও অগ্রভাগ তিনটি গভীর খাঁজে বিভক্ত।

প্রাণিস্থান: কর্কা বাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংরক্ষণের সময়: বৃক্ষের প্রাপ্তে চ্যাপ্টা প্রাকৃতির ফল গুচ্ছাকারে সজ্জিত। চ্যাপ্টা পত্র প্রতি ফলের প্রাপ্তদেশে দুইটি বীজ রয়েছে। এপ্রিল-মে মাসে বীজ পরিপূর্ণ হয়।

বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বপন: বীজ বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায়না। পট বা ব্যাগে সরাসরি বীজ বপন করা যায়।



ছবি - ৪১.১: উদাল ফল ও বীজ



ছবি - ৪১.৩: উদাল গাছ



ছবি - ৪১.২: উদাল চারা

চারা রূপণ: পলিব্যাগে উত্তোলিত ১ বছর বয়সী চারা বর্ষার শুরুতেই লাগানো যেতে পারে।

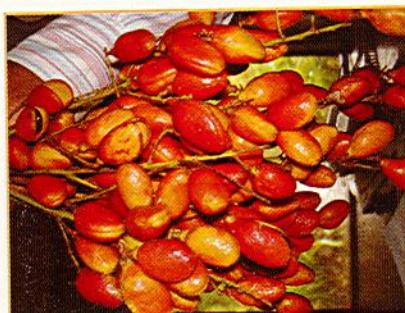
২৩. বারেলা, ঝাউয়া - *Holigarna caustica (H. longifolia)*

বর্ণনা: দীর্ঘ চিরহরিৎ বৃক্ষ, ডালপালা বিস্তৃত ও ঘন পল্লবময়। কাণ্ড মসৃণ, ধূসর বর্ণের, কাটলে সাদা রস নিগত হয়ে যা কিছুক্ষণের মধ্যে লাল বর্ণ ধারণ করে। পাতা বেশ লম্বা, ৩০-৬০ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফল প্রায় ২.৫ সে.মি. লম্বা।

প্রাণিস্থান: কর্বাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: জুলাই - আগস্ট।

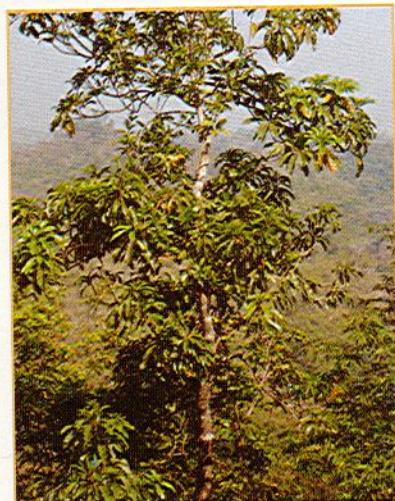
বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বপন: গাছ হতে সরাসরি ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল স্তুপাকারে ৩ - ৪ দিন রেখে পানিতে কচলিয়ে বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ বেশীদিন সংরক্ষণ করা যায়না এবং বপনের ১০-১৫ দিনের মধ্যে চারা গজানো শুরু হয়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১২০০-১৫০০ টি।



ছবি - ৪২.১: বারেলা ফল



ছবি - ৪২.২: বারেলা চারা



ছবি - ৪২.৩: বারেলা গাছ।

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন-জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়। তবে বনায়নে এসব প্রজাতি লাগানো হয়না বললেই চলে।

২৪. তেলসুর - *Hopea odorata*

বর্ণনা: ২৫ - ৩০ মি উচ্চতাসম্পন্ন চির সরুজ বৃক্ষ। কাণ্ড সরল, গোলাকার, বেশ উঁচু পর্যন্ত ডালপালা মুক্ত বাকল কালো, লম্বালম্বি ভাঁজ আছে। পাতা দেখতে সরুজ ও প্রান্তদেশ ঢেউ খেলানো। ফলের উপরিভাগে দুটি পাখনা রয়েছে।

প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, কক্ষবাজার, বান্দরবন ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে তেলসুর পাওয়া যায়। মধুপুর শালবন এলাকায় কিছু লাগানো তেলসুর গাছ দেখা যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: মে - জুন।

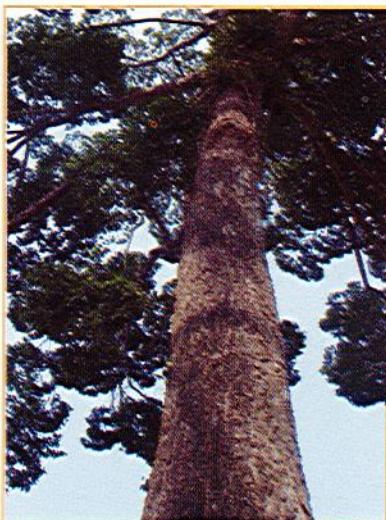
বীজ সংগ্রহ ও বপন পদ্ধতি: ফল পাকলে মাটিতে পড়ে। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে ফল সংগ্রহ করে গোটা ফলই বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বীজের পাখনা কেটে সামান্য বাঁকা করে বীজ বপন করা ভাল। সতেজ বীজ হলে ৪ - ৫ দিনের মধ্যে চারা গজানো শুরু হয়। বীজ বপন করতে দেরী হলে বীজের অঙ্কুরোদগমের হার কমে যায়। কেজি প্রতি বীজের সংখ্যা ১,৮০০ - ২,০০০ টি। ৪ - ৫ দিনের মধ্যে বীজ গজানো শুরু হয় এবং ভাল বীজ হলে ৭০-৮০% বীজ অঙ্কুরোদগম লাভ করে।



ছবি - ৪৩.১: তেলসুর বীজ



ছবি - ৪৩.২: তেলসুর চারা



ছবি - ৪৩.৩: তেলসুর গাছ

চারা রোপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন-জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

২৫. চালমুগরা - *Hydnocarpus kurzii*

বর্ণনা: চিরহরিৎ মাঝারি আকারের বৃক্ষ, উচ্চতায় ৬ - ৮ মি. পর্যন্ত হয়। গাছের মূল শাখা লম্বা হলেও প্রশাখা সাধারণত: নীচের দিকে ঝুলে থাকে। পাতা প্রায় ২০ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। হলুদ রংয়ের ছোট ছোট ফুল পত্রকক্ষে ছোট গুচ্ছে ফোটে। চালমুগরা বীজের তেল কুঠ রোগের চিকিৎসায় অত্যন্ত উপকারী।

প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। তবে এদের সংখ্যা এখন খুবই কম।

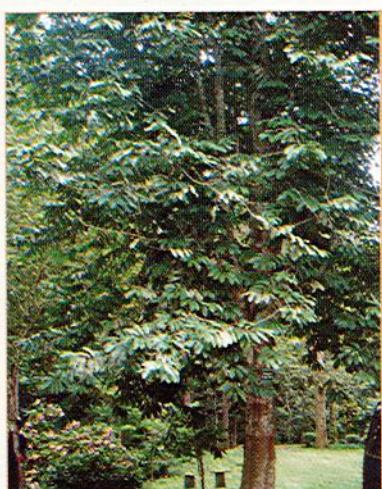
বীজ সংগ্রহের সময়: নভেম্বর মাসে বীজ সংগ্রহ করা যায়।

বীজ সংগ্রহ ও বপন পদ্ধতি: ফল সংগ্রহ করে বীজ নিষ্কাশন করা যায়। ব্যাগে সরাসরি বীজ বপন করতে হয়। ৬০ - ৬৫ দিনের মধ্যে বীজ গজানো শুরু হয়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৩০০ - ৩৫০ টি। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার ৪০% এর অধিক।



চালমুগরা, ডালমুগরি

ছবি - ৪৪.১: চালমুগরা বীজ



ছবি - ৪৪.৩: চালমুগরা গাছ



ছবি - ৪৪.২: চালমুগরা চারা

চারা রোপণ: এক বছর বয়সী চারা লাগানোই উত্তম।

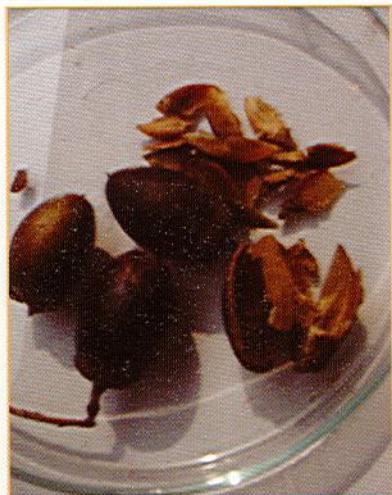
২৬. সিদা জারুল - *Lagerstroemia parviflora*

বর্ণনা: ৩০ - ৪০ মিটার উচু বৃহদাকার পত্রবরা বৃক্ষ। পাতা ৩ - ৭ সে. মি. লম্বা। সাধারণত শাল বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মে।

প্রাণিস্থান: মধুপুর ও ভাওয়াল শাল বন এলাকায় জন্মে। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামেও পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: জানুয়ারি - মার্চ।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বগন: পরিপক্ষ ক্যাপসুলে বীজ ঘরে পরার আগে ফল সংগ্রহ করে নিতে হয়। ফল শুকানোর পর ছেট ছেট বীজ পলিথিন সিট বা পাত্রে সংগ্রহ করা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৩০,০০০ - ৬০,০০০ টি। শুকনা বীজ ২ - ৩ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। বীজ ট্রেতে বপন করা উচ্চম।



ছবি - ৪৫.১: সিদা জারুল ফল ও বীজ



ছবি - ৪৫.২: সিদা জারুল গাছ

চারা রোপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

২৭. মেঞ্চা, মেদা - *Litsea monopetala*

বর্ণনা: ২৫ - ৩০ মি. উঁচু মাঝারি আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। বাকল মসৃণ, ধূসর। পাতা বৃত্তাকৃতির, ৭ - ২০ সে. মি. লম্বা। ফুল সবুজাত হলুদ।

প্রাণিস্থান: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। এছাড়া গাজীপুর, মধুপুর এবং দিনাজপুরেও পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: মে - জুলাই।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ ব্যবহার: ফল পরিপক্ষ হলে কাল আকার ধারণ করে। ফলভূক ছাড়িয়ে বীজ সংগ্রহ করা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ প্রায় ৫,৩০০ - ৫৫০০ টি। বীজ সংগ্রহের পর পরই বীজ ব্যবহার করা উচিত, অন্যথায় বীজ অঙ্কুরোদগমের হার কমে যাবে। সতেজ বীজে অঙ্কুরোদগমের হার ৬০%।



ছবি - ৪৬.১: মেঞ্চা, মেদা ফল



ছবি - ৪৬.২: মেঞ্চা, মেদা চারা



ছবি - ৪৬.৩: মেঞ্চা, মেদা গাছ

চারা রোপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

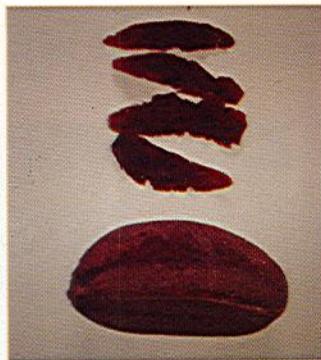
২৮. রক্তন - *Lophopetalum fimbriatum*

বর্ণনা: মধ্যম হতে দীর্ঘাকৃতির চিরসবুজ বৃক্ষ ৩০ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। কাণ্ড অনেক সময় লম্বালম্বিভাবে ঢেউ খেলানো নিচের দিকে অধিমূল আছে। পাতা ৭ - ১৫ সে. মি., ফুল গাঢ় লাল। ফল কাষ্ঠল, কামরাঙ্গার মতো ৩ - ৪ টি খাঁজ বিদ্যমান।

প্রাণিস্থান: কর্বুবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। শ্রীমঙ্গলের লাউয়াছুর ফরেস্টে কিছু গাছ লাগানো হয়েছে।

বীজ সংগ্রহের সময়: আগস্ট - সেপ্টেম্বর।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ ব্যবহার: পরিপক্ষ ফল সংগ্রহ করে শুকনা জায়গায় ২ - ৩ দিন শুকালে ফল ফেটে পাতলা বীজ পাওয়া যায়। প্রতি কেজিতে পাখা সহ বীজের সংখ্যা আনুমানিক ৫,২০০ টি। বীজ বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না। নাসারি বেড় বা ব্যাগে বীজ সরাসরি ব্যবহার করা যায়। বীজের অঙ্কুরোদগম হার প্রায় ৪০%।



ছবি - ৪৭.১: রক্তন ফল ও বীজ



ছবি - ৪৭.৩: রক্তন গাছ



ছবি - ৪৭.২: রক্তন চারা

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন-জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

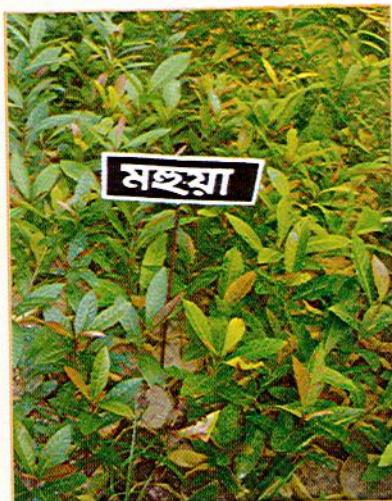
২৯. মহুয়া - *Madhuca indica*

বর্ণনা: মহুয়া সাধারণত ৭ - ১০ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন একটি পত্রবরা বৃক্ষ। পাতা ঘনভাবে পল্লবের অগ্রভাগে বিন্যস্ত, ১২-২০ সে. মি. লম্বা। মহুয়া প্রধানত: শোভাবর্ধনকারী গাছ হিসাবেই বেশী ব্যবহৃত হয়। ফুল সাদা, মিষ্ঠি গন্ধযুক্ত, ফল ডিখাকৃতি প্রায় ২-৩ সে. মি. লম্বা।

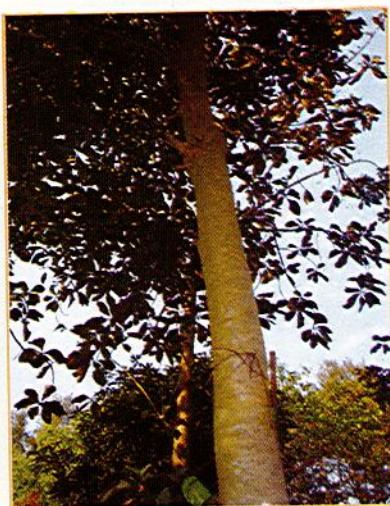
প্রাণিস্থান: দেশের প্রায় সর্বত্রই লাগানো হয়।

বীজ সংগ্রহের সময়: জুন- জুলাই।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বপন: গাছ হতে সরাসরি ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল স্তুপাকারে ৩-৪ দিন রেখে পানিতে কচলিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজ ২০ - ৩০ দিনের মধ্যে বপন করতে হয়। বীজ বপনের ১০ - ১৫ দিনের মধ্যে বীজ হতে চারা গজানো শুরু হয়।



ছবি - ৪৮.২: মহুয়া চারা



ছবি - ৪৮.৩: মহুয়া গাছ

চারা রোপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো হয়।

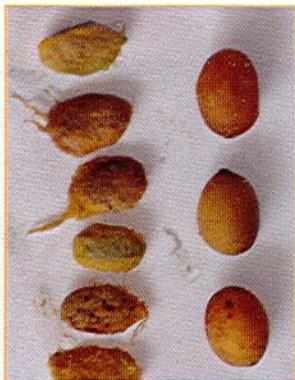
৩০. উরিআম - *Mangifera sylvatica*

বর্ণনা: ৩০ - ৫০ মি. উচু বড় আকারের চির সবুজ বৃক্ষ। কাঞ্চ সরল, গোলাকার, লম্বা, কাটলে ধূসর সাদাটে কষ নির্গত হয়, পাতা দেখতে আমের পাতার মতো কিন্তু আকারে ছেট। ফুল শাখান্বিত পুষ্প মঞ্জুরীতে বিন্যস্ত। ফল দেখতে অনেকটা আমের মতো, তবে পার্শ্বদেশ তীর্যক।

প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের প্রাক্তিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংঘর্ষের সময়: মে - জুন।

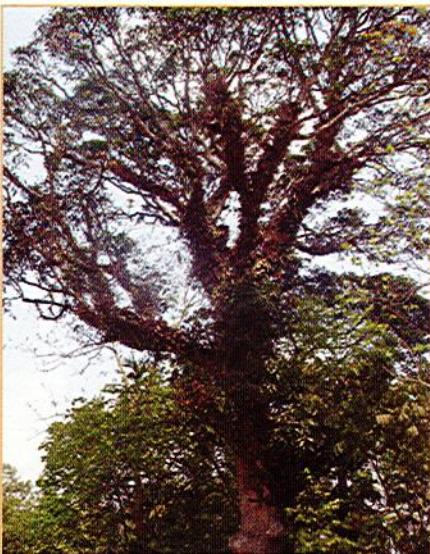
বীজ সংঘর্ষের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বপন: রসালো ফলত্বক ছাড়িয়ে বীজ সরাসরি ব্যাগে বপন করা যায়। ১০ - ১২ দিনের মধ্যে বীজ গজানো শুরু হয় এবং অঙ্কুরোদগমের হার ৭০% এর অধিক।



ছবি - ৪৯.১: উরিআম ফল ও বীজ



ছবি - ৪৯.২: উরিআম চারা।



ছবি - ৪৯.৩: উরিআম গাছ

চারা রোপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

৩১. নাগেশ্বর - *Mesua nagassarium*

বর্ণনা: মধ্য থেকে বড় আকৃতির চির সবুজ বৃক্ষ। উচ্চতা ১৫ - ২০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। অনেক সময় গাছের গোড়ায় অধিমূল থাকে। ছোট পাতা লাল বা সাদা পরে ঘন সবুজ বর্ণ ধারণ করে। ফুল সাদা রঙের ও সুগন্ধ যুক্ত। ডিখাকৃতি ফলে ৩ - ৪ টি বীজ থাকে।

প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। ইদানিং শোভা বর্ধনকারী গাছ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়।

বীজ সংগ্রহের সময়: জুলাই - সেপ্টেম্বর।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: ফল গাছ থেকে সরাসরি বা গাছের নীচ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। বীজের বাহিরের আবরণ বাদামী ও বীজ বেশ শক্ত এবং বীজ অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা প্রায় ১০০০ - ১৫০০ টি।

বীজ বপন: মার্চ মাসের প্রথম দিকে পলি ব্যাগে ১টি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের ৩ সপ্তাহের মধ্যেই অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয়।



ছবি - ৫০.১: নাগেশ্বর বীজ



ছবি - ৫০.২: নাগেশ্বর চারা



ছবি - ৫০.৩: নাগেশ্বর গাছ

চারা রোপণ: ১ বছর বয়সের চারা বর্ষার শুরুতেই রোপণ করতে হবে।

৩২. চম্পা, চম্পাফুল - *Michelia champaca*

বর্ণনা: চম্পা ৩০ - ৪০ মিটারের অধিক উচ্চতাসম্পন্ন চির সবুজ বৃক্ষ। কচি শাখা পল্লবে ছোট ছোট দানা সদৃশ্য লেন্টিসেল বিরাজমান। পাতা লম্বাটে, ১০ - ২০ সে. মি. লম্বা। ফুল হলুদ, সুগন্ধযুক্ত। ফল গুচ্ছাকার। ছোট ছোট কাঠল ফল, ৭ - ১৫ সে. মি. লম্বা, গুচ্ছে বিদ্যমান।

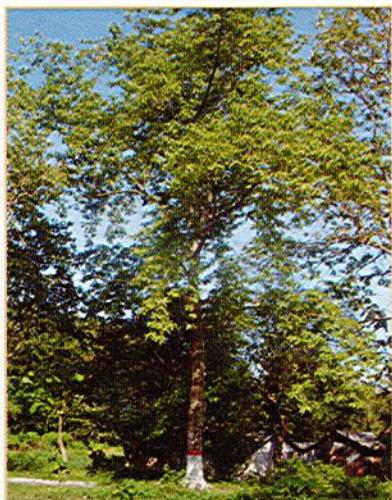
প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, সিলেট, করুণাবাজার ও পার্বত্য জেলা সমুদ্রের প্রাক্তিক বনাঞ্চলে এ গাছ জন্মে। এছাড়া রাস্তার পাশে ও অফিস সংলগ্ন অনেক স্থানে এ গাছ লাগানো হয়।

বীজ সংগ্রহের সময়: মার্চ মাসে হলুদ ফুল ফোঠে। ফুল খুবই সুস্থান সৃষ্টি করে। আগস্ট - সেপ্টেম্বর মাসে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বপন: ফল পরিপক্ষ হলে গাছ হতে গোলাকার ফলগুলো সরাসরি সংগ্রহ করে নিতে হয়। প্রতিটি ফলে ৫ - ৬ টি বীজ থাকে। ফল সমূহ সংগ্রহের পর ছায়াযুক্ত স্থানে স্তুপাকারে রাখলে ৩ - ৪ দিনের মধ্যে ফলগুলো ফাটতে শুরু করে। বীজ বেশী সময় সংরক্ষণ করা যায় না। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১০,০০০ - ১২,০০০ টি। বীজ বপনের ১০ - ১২ দিনের মধ্যে চারা গজানো শুরু হয় এবং ৪ - ৫ সপ্তাহের মধ্যে গজানো শেষ হয়। ছায়াযুক্ত নার্সারি বেড়ে বীজ বপন করতে হয়।



ছবি - ৫১.১: চম্পা ফল ও বীজ



ছবি - ৫১.৩: চম্পা গাছ



ছবি - ৫১.২: চম্পা চারা

চারা রোপণ: মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর পরই এক বছর বয়সী চারা লাগানো ভাল। বনায়নে ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো হয়।

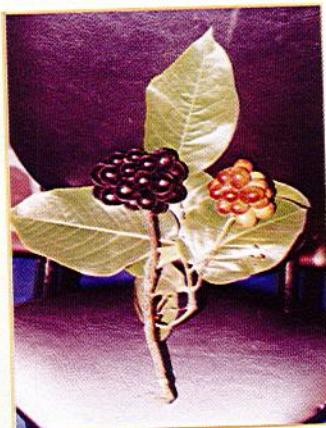
৩৩. গাঞ্জি গজারি - *Miliusa velutina*

বিবরণ: মধ্যমাকৃতির পত্রবরা বৃক্ষ। বাকল বাদামী বা কালচে রং এর। পাতা পান পাতা আকৃতির তবে একটু বেশি চ্যাপ্টা, উপর নিচ লোমশ ফুল হালকা হলুদ।

প্রাণিস্থান: ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও দিনাজপুরের শালবন এলাকায় পাওয়া যায়।

বীজ সংরক্ষণের সময়: মে - জুন।

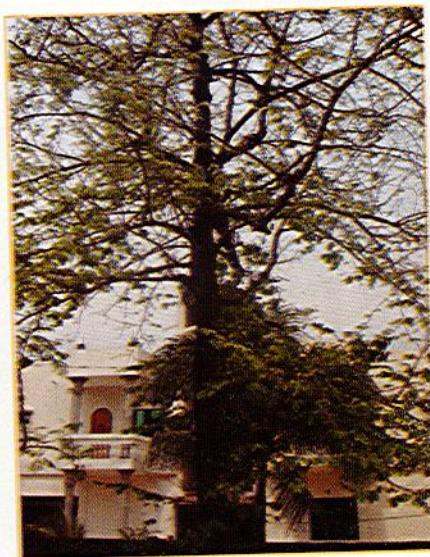
বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বপন: পরিপক্ষ বীজ সরাসরি পট বা ব্যাগে বপন করা যায়। অনেক সময় নামসারি বেডে ও বীজ বপন করা যায়।



ছবি - ৫২.১: গাঞ্জি গজারি ফল/ বীজ



ছবি - ৫২.২: গাঞ্জি গজারি চারা



ছবি - ৫২.৩: গাঞ্জি গজারি গাছ

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন-জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো হয়।

৩৪. বাঁশ পাতা - *Podocarpus nerifolia*

বিবরণ: বড় আকারের চির সবুজ গাছ। বাকল সবুজাভ খুসর বা বাদামী। পাতা সরু, ১২ - ১৫ সে. মি. লম্বা ও বল্লমাকৃতির।

প্রাণিস্থান: বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বনাঞ্চলে একসময় পাওয়া যেত, বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশে কয়েকটি গাছ আছে মাত্র। মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেশ কিছু গাছ লাগানো হয়েছে।

বীজ সংরক্ষণের সময়: জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি।

বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: ফল লম্বাটে, ৩ - ৪ সে. মি. লম্বা হয়। বীজ খোঁসা বা শাঁস হতে ছড়াতে গেলে বীজের ক্ষতি হয় বলে শাঁসসহ বীজ সংরক্ষণ করা যায়, তবে ৬ সপ্তাহের বেশী বীজ সংরক্ষণ করা উচিত নয়।

বীজ ব্যবহার: বীজ সরাসরি পট বা ব্যাগে ব্যবহার করা উচিত। ১০ - ১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম শুরু হয়।



ছবি - ৫৩.১: বাঁশ পাতা ফল/ বীজ



ছবি - ৫৩.৩: বাঁশ পাতা গাছ



ছবি - ৫৩.২: বাঁশ পাতা চারা

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন-জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

৩৫. গুটগুট্টা, নিউর, লুও-বাদি - *Protium serratum (Bursera serrata)*

বর্ণনা: ৩০-৪০ মি. উচু বৃহৎ আকারের চির সবুজ হতে আংশিক পত্রঝরা বৃক্ষ। বাকল বাদামী বা হালকা ধূসর বর্ণের। পাতা যৌগিক। পত্রফলক ৫ - ১১ সে. মি. লম্বা। ফল উপবৃত্তাকৃতি, ২ - ৩ টি খাজে ঢেউ খেলানো।

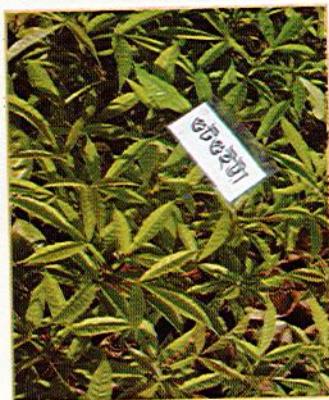
প্রাণিস্থান: কক্রবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শালবন (টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ) এলাকায় জন্মে।

বীজ সংগ্রহের সময়: জুলাই-আগস্ট।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও বীজ বপন : বীজ সরাসরি পট বা ব্যাগে বপন করা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১২০০ - ১৫০০ টি। সাধারণভাবে অঙ্কুরোদগম হতে সময় নেয় ২০ - ২৫ দিন এবং অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৩০ - ৪০ ভাগ।



ছবি - ৫৪.১: গুটগুট্টা ফল



ছবি - ৫৪.২: গুটগুট্টা চারা



ছবি - ৫৪.৩: গুটগুট্টা গাছ

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

৩৬. মুস, মুসিগঞ্জা - *Pterospermum acerifolium*

বর্ণনা: দীর্ঘাকৃতির চির সবুজ বৃক্ষ, ২৫ - ৩০ মি. পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। পাতা অর্ধবৃত্তাকার থেকে ২০ - ৪০ সে. মি. লম্বা ও ১৫ - ৪০ সে. মি. চওড়া। ফুল সাদা রং এর ও সুগন্ধীযুক্ত। ফল কাষ্টল, ৫ - ১৫ সে. মি. লম্বা, কামরাঙ্গার মতো, তবে হালকা ভাবে খাজযুক্ত।

প্রাণিস্থান: সিলেট, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: মার্চ - এপ্রিল।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: পরিপক্ষ ফল রোদে শুকানোর পর ফেটে গিয়ে পাতলা বীজ সমূহ বের হয়ে আসে। বীজ বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায় না। বীজ সরাসরি ব্যাগে বপন করা হয়।



ছবি - ৫৫.১: মুস ফল ও বীজ



ছবি - ৫৫.২: মুস চারা



ছবি - ৫৫.৩: মুস গাছ

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন-জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

৩৭. বুদ্ধি নারিকেল, নারিকেলি - *Pterygota alata* (*Sterculia alata*)

বর্ণনা: দীর্ঘাকৃতির (৫০ মি. এর বেশী) পাতা ঝরা বৃক্ষ, কাণ্ড গোলাকার, সরল। প্রধান শাখাসমূহ আনুভূমিক ভাবে বিস্তৃত। পাতা পান আকৃতির, ১০ - ২৫ সে. মি. লম্বা ও ৭ - ২০ সে. মি. চওড়া। ফল কাষ্ঠল, ১০ - ১২ সে. মি. গুচ্ছকারে সজ্জিত।

প্রাপ্তিষ্ঠান: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে রাস্তার পাশে লাগাতে দেখা যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: এপ্রিল - জুন।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বপন: ফল হতে বীজ আলাদা করে কয়েক মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়।



ছবি - ৫৬.১: নারিকেলি বীজ



ছবি - ৫৬.২: নারিকেলি চারা



ছবি - ৫৬.৩: নারিকেলি গাছ

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

৩৮. অশোক - *Saraca asoka*

বর্ণনা: চির হরিৎ প্রায় ৮ - ১০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট স্ফুদ্রাকৃতির বৃক্ষ। ডালপালা বিস্তৃত ও ঘন পল্লবময়। গাছের কাণ্ড মুকুটাকৃতির। পাতা একান্তর, যৌগিক, ৩০ - ৩৫ সে. মি. লম্বা, পত্রফলক ঘনসবুজ, লম্বাটে, ৭ - ২৫ সে. মি. লম্বা ও ২ - ৪ সে. মি. চওড়া। লাল - কমলা রঙের ফুল ফেন্স্ট্রারি - এপ্রিল মাসে থোকায় থোকায় ধরে।

প্রাণিস্থান: পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়। অনেক স্থানে পাক, বাঢ়ির আঙিনায় লাগানো হয়ে থাকে।

বীজ সংগ্রহের সময়: ফল শিম জাতীয় মাংসল ও লাল। পাকলে অনেকটা তেঁতুলের মত হয়। একটি ফলে বেশ কিছু বীজ থাকে। জুন-জুলাই মাসে বীজ সংগ্রহ করা যায়। প্রতি কেজিতে ৫০ - ৬০ টি বীজ থাকে।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: পাকা শিমের রং খয়েরী হয় এবং জুলাই মাসে শিম সংগ্রহ করা হয়। একটি ফলে ২- ৮ টি বীজ থাকে। বীজ বপনের পূর্বে ১২ ঘন্টা ঠাতা পানিতে ভিজিয়ে রাখা ভাল। বীজ সংগ্রহের সাথে সাথে লাগাতে হয় কেননা এর বীজ বেশীদিন সংরক্ষণ করা যায় না।

বীজ বপন: পলিব্যাগে একটি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের ৭ - ১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয়। ভালো বীজ হলে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ বীজ অঙ্কুরোদগম লাভ করে। নাসারিতে চারার বর্ধন হার মধ্যম এবং বছরে প্রায় ১ মিটার পর্যন্ত বাড়ে।



ছবি - ৫৭.১: অশোক ফুল



ছবি - ৫৭.৩: অশোক গাছ



ছবি - ৫৭.২: অশোক চারা

চারা রোপণ: এক বছর বয়সের চারা বর্ষার প্রারম্ভে লাগানো হয়।

৩৯. কনক, বোনাক - *Schima wallichii*

বর্ণনা: উচ্চতায় ২০ - ২৫ মিটার, বড় আকারের চির সবুজ গাছ। বাকল গাঢ় ধূসর থেকে কালো বর্ণের, লম্বালম্বি ভাবে ফাটা ও চেউ খেলানো পাতা সরল, উপবৃত্তাকার, লম্বাটে, ৮ - ২০ সে.মি. লম্বা ও ৩ - ৮ সে.মি. চওড়া পত্রকক্ষে সজিত সাদা ফুল প্রায় ৫ সে.মি. ব্যাসযুক্ত। ফল ক্যাপসুল, ১ - ২ সে.মি. ব্যাসযুক্ত।

প্রাণিস্থান: সিলেট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

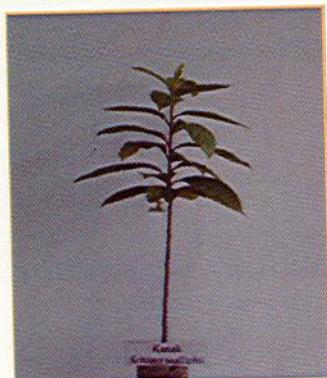
বীজ সংগ্রহের সময়: এপ্রিল-জুন।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: ফল ৫ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ক্যাপসুল। প্রতি প্রকোষ্ঠে ২-৬ টি বীজ থাকে। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১৬০,০০০ - ৩৫০,০০০ টি। বীজ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বীজ বপন উভয় কেননা বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বেশী দিন থাকেনা।

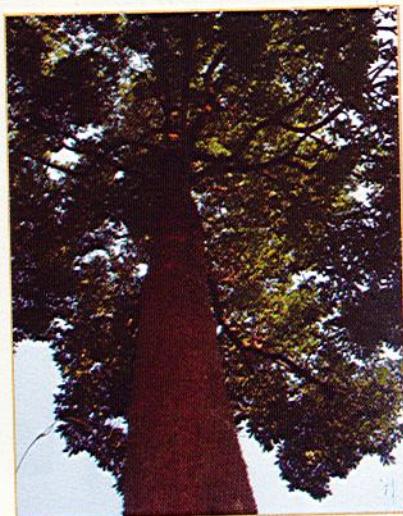
বীজ বপন: বীজ ট্রেতে বপন করা উভয় এবং ১ - ৩ সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হয়।



ছবি - ৫৮.১: কনক ফল ও বীজ



ছবি - ৫৮.২: কনক চারা



ছবি - ৫৮.৩: কনক গাছ

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

৪০. কুসুম, জয়না - *Schleichia oleosa*

বর্ণনা: ৩০ - ৩৫ মি. বড় আকারের পত্র ঝরা বৃক্ষ। কাণ্ড অনেকটা এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো। বাকল গাঢ় বাদামী, চক্রাকারে টুকরা টুকরা খসে পড়ে। পাতা ঘৌগিক, পত্রফলক ৪ - ৮ জোড়া, কচি পত্রফলক লালচে রং এর।

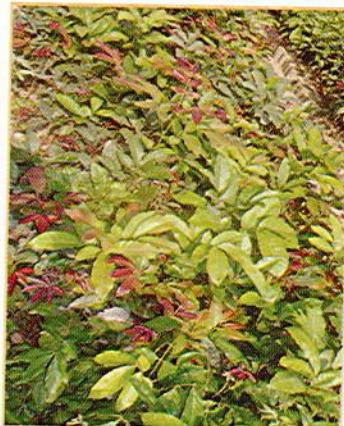
প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মধুপুরের শাল বন এলাকায় পাওয়া যায়।

বীজ সংরক্ষণের সময়: জুন - জুলাই।

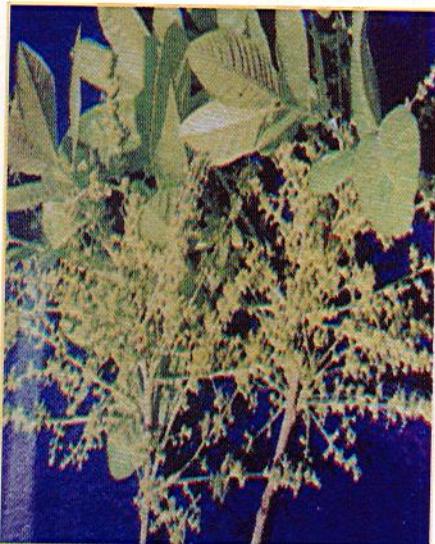
বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ ব্যবহার: বীজের সংখ্য ১৫০০ - ২২০০ টি প্রতি কেজিতে। পরিপক্ষ ফল হতে বীজ সংগ্রহপূর্বক সরাসরি পলিব্যাগ বা পটে ব্যবহার করা যায়।



ছবি - ৫৯.১: কুসুম ফল ও বীজ



ছবি - ৫৯.২: কুসুম চারা



ছবি - ৫৯.৩: কুসুম গাছ

চারা রোপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

৪১. ধারমারা - *Stereospermum personatum*

বর্ণনা: বৃহদাকার চিরসবুজ গাছ। উচ্চতায় ২০-২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। বাকল হলুদাভ, ধূসর। পাতা যৌগিক, ৩০ - ৪৫ সে. মি. লম্বা, পত্রফলক ৫ - ৭ টি উপবৃত্তাকার লম্বাটে। শাখাবিত মঞ্জুরীতে সুস্থান ফুল বিন্যস্ত থাকে। ফল সাজনার মতো কিন্তু একটু মোচড়ানো।

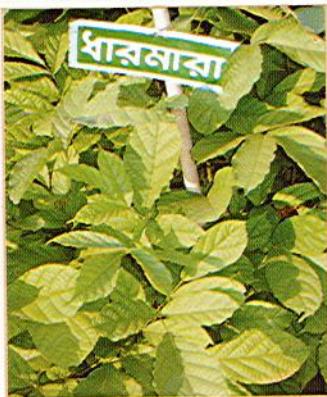
প্রাণিস্থান: বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের থাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।
বীজ সংঘর্ষের সময়: ফেব্রুয়ারি - মার্চ।

বীজ সংঘর্ষের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: লম্বা শিম পরিপক্ষ হলে রোদে শুকিয়ে বীজ সংঘর্ষ করতে হবে।

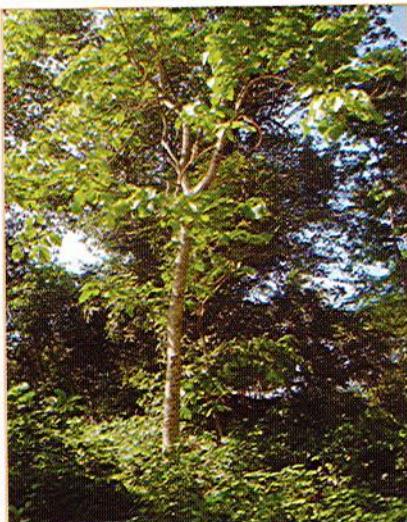
বীজ বপন: বীজ সরাসরি পট বা ব্যাগে বপন করা যায়। বীজ বপনের ৭ - ১০ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম শুরু হয় এবং অঙ্কুরোদগমের হার ৬০%।



ছবি - ৬০.১: ধারমারা ফল ও বীজ



ছবি - ৬০.২: ধারমারা চারা



ছবি - ৬০.৩: ধারমারা গাছ

চারা রূপণ: এক বছর বয়সী চারা জুন - জুলাই মাসে থালি করে লাগানো যায়। বন বাগান এলাকায় সাধারণত: ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো যায়।

৪২. আমচুভুল, সিভিট - *Swintonia floribunda*

বর্ণনা: বৃহদাকার প্রকাও পত্র ঝারা বৃক্ষ, ৫০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। কাণ্ডের বেড় ৫-৭ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। গোড়ায় অধিমূল আছে। বাকল ধূসর সাদা, মসৃণ। পাতা সরল, লম্বাটে, অনেকটা আমপাতার মতো, ১০ - ১৫ সে. মি. লম্বা। ফল পাঁচটি পক্ষলসদৃশ পরিপক্ষ বৃত্যাংশের উপর বিন্যস্ত।

প্রাণিস্থান: বৃহস্পৰ্শ পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও কর্বুবাজারের বনাঞ্চলে পাওয়া যায়। শ্রীমঙ্গলের সাতগাঁও চা বাগানে ১৪-১৫ টি লাগানো গাছ আছে।

বীজ সংগ্রহের সময়: এপ্রিল - মে।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: ফল ছেট পাখা যুক্ত। গাছের ডাল বাকি দিয়ে বা গাছের নীচ হতে বীজ সংগ্রহ করা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৭৫০- ৮০০ টির মত।

বীজ বপন: বীজ সংগ্রহের ২ - ৩ দিনের মধ্যে বীজ রোপণ করতে হয়। ফল বা বীজ সরাসরি বেড় বা পলিব্যাগে লাগানো যায়।



ছবি - ৬১.১: সিভিট বীজ



ছবি - ৬১.৩: সিভিট গাছ



ছবি - ৬১.২: সিভিট চারা

চারা রোপণ: বর্ষার প্রারম্ভে জুন - জুলাই মাসে এক বছর বয়সী চারা লাগানো যায়। অনেক সময় থালিতে ও সরাসরি বীজ বপনের মাধ্যমে চারা লাগানো যায়।

৪৩. জাম, কালোজাম - *Syzygium cumini*

বর্ণনা: বৃহৎ চিরহরিৎ বৃক্ষ। গাছের উচ্চতা ১৫ - ২৫ মিটার মতো হয়। বাকল মসৃণ, ও ধূসর রংয়ের হয়। ফল রসালো, পাতা সরল, ফল ২.৫ সে. মি. এর মতো লম্বা, অনেকটা লম্বা-গোলাকৃতির। কাঁচা ফলের রং সবুজ তবে পাকলে বেগুনি বা কালো রং ধারণ করে।

প্রাণিস্থান: দেশের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে ও বনাঞ্চলেও দেখা যায়, তবে পূর্বের তুলনায় এ গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

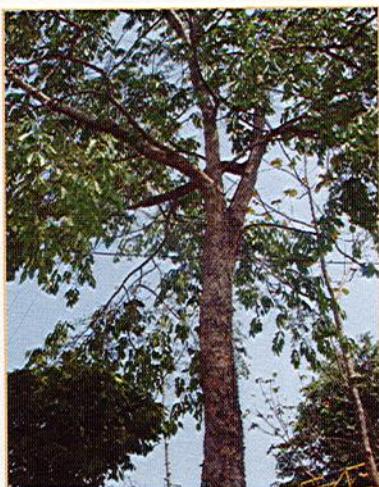
বীজ সংগ্রহের সময়: জুন - আগস্ট।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ভাল মা গাছ নির্বাচন করে গাছ থেকে বা ফল খাওয়ার পর ফেলে দেওয়া বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ বেশীদিন সংরক্ষণ করা যায়না। প্রতি কেজিতে প্রায় ১,৫০০ - ১,৭০০ টি বীজ পাওয়া যায়।

বীজ ব্যবহার: নার্সারি বেড়ে বা পলিব্যাগে বীজ সংগ্রহের পর পরই লাগানো প্রয়োজন। বীজ ভালো হলে অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৯০ ভাগ এবং ৩০ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন হয়।



ছবি - ৬২.১: জাম ফল ও বীজ



ছবি - ৬২.৩: জাম গাছ



ছবি - ৬২.২: জাম চারা

চারা রোপণ: বর্ষার প্রারম্ভে জুন - জুলাই মাসে এক বছর বয়সী চারা লাগানো যায়। অনেক সময় থালিতে ও সরাসরি বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে গাছ লাগানো যায়।

৪৪. ঢাকি জাম - *Syzygium grandis*

বর্ণনা: ঢাকি জাম ২০ - ৩০ মি. উচ্চতাসম্পন্ন চির সবুজ বৃক্ষ। গাছের বেড ১.৫ - ২.০ মিটার পর্যন্ত হয়। পাতা বড়, ১৫ - ২০ সে. মি. লম্বা। ফুল শাখাবিত ঘন মঞ্জুরীতে বিন্যস্ত। ফল ২.৫ - ৪.০ সে. মি. লম্বা বেরি।

প্রাণিস্থান: কক্রবাজার, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: জুন-জুলাই।

বীজ সংগ্রহ ও বপন পদ্ধতি: পরিপক্ষ বীজ সরাসরি গাছ হতে সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া গাছের নীচ হতে ও বীজ সংগ্রহ করা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ১,২০০ - ১,৩০০ টি। বীজ সংগ্রহের পর চর্ঠের বস্তায় ভরে বা স্তুপাকারে ৮ - ৯ দিন জাগ দিয়ে রাখলে ফলত্বক পঁচে বীজ বের করা হয়। বীজ সংগ্রহের ১৫ - ২০ দিনের মধ্যে বপন করলে অঙ্কুরোদগমের হার বেশী পাওয়া যায়। চারা গজাতে ২০ - ২৫ দিন সময় লাগে। সতেজ বীজ হলে ৯০% বীজ গজানো পাওয়া যায়।



ছবি - ৬৩.১: ঢাকি জাম ফল ও বীজ



ছবি - ৬৩.২: ঢাকি জাম চারা



ছবি - ৬৩.৩: ঢাকি জাম গাছ

চারা রূপণ: বর্ষার প্রারম্ভে জুন - জুলাই মাসে এক বছর বয়সী চারা লাগানো যায়। অনেক সময় থালিতে ও সরাসরি বীজ বপনের মাধ্যমে গাছ লাগানো যায়।

৪৫. তেতুল - *Tamarindus indica*

বর্ণনা: বহুকার সুশী চিরহরিৎ বৃক্ষ। পাতা যৌগিক, বাকল বাদামী ও অমসৃণ। গাছ ২০ - ২৫ মিটার পর্যন্ত উচ্চ হয়ে থাকে। ফল পড়, ৭ - ১৫ সে. মি. লম্বা হয়, ফল টক ও রসাল। কাঁচা অবস্থায় ফলের সবুজ ত্তুক শাঁসের সাথে যুক্ত থাকলেও পাকার পর ফল থেকে শাঁস আলাদা হয়ে যায়।

প্রাণিস্থান: দেশের সর্বত্রই বিস্তিতভাবে দেখা যায়।

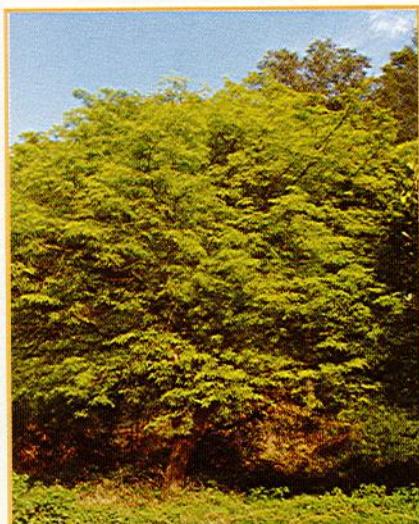
বীজ সংগ্রহের সময়: মার্চ - এপ্রিল।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: গাছ থেকে পাকা ফল বা সীম পেড়ে মণ আলাদা করে বীজ সংগ্রহ করা যায়। বীজ মণ থেকে আলাদা করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি কেজিতে ৮০০ - ১,০০০ টির মত বীজ হয়।

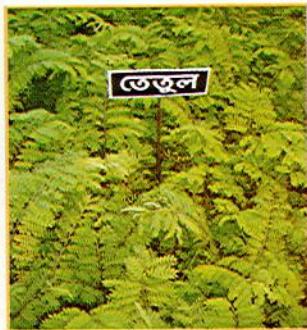
বীজ বপন পদ্ধতি: সিম জাতীয় অন্যান্য ফলের মত তেতুল বীজ বপনের পূর্বে শোধন করা প্রয়োজন। সাধারণত বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা ইষ্টবুঙ্গ পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর পলিব্যাগে ১ টি করে বীজ বপন করা যায়। অঙ্কুরোদগমের হার ৬০ - ৭০ ভাগ এবং ১০ - ১৫ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরোদগম সম্পূর্ণ হয়।



ছবি - ৬৪.১: তেতুল বীজ



ছবি - ৬৪.৩: তেতুল গাছ



ছবি - ৬৪.২: তেতুল চারা

চারা রোপণ: ১ বৎসর বয়সের চারা লাগানোই উত্তম, তবে নার্সারিতে সঠিক পরিচর্যা পেলে ৪ - ৫ মাস বয়সের চারা ও লাগানো যায়।

৪৬. অর্জুন - *Terminalia arjuna*

বর্ণনা: মাঝারি ধরনের পত্রবরা বৃক্ষ। পরিণত বয়সে ১০ - ১৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। বাকল পাতলা স্তরে স্তরে বিভক্ত হয়। পাতা সরল, প্রতিমুখ ১০ - ১৫ সে. মি লম্বা। ফল লম্বাটে ও ৫ ভাগে বিভক্ত।

প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম ও সিলেটে বন এলাকায় ও বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বিশেষ করে রাস্তার ধারে অর্জুন গাছ দেখা যায়। নিচু স্থানেতে এলাকায় অর্জুন ভাল জন্মে।

বীজ সংগ্রহের সময়: মার্চ - এপ্রিল।

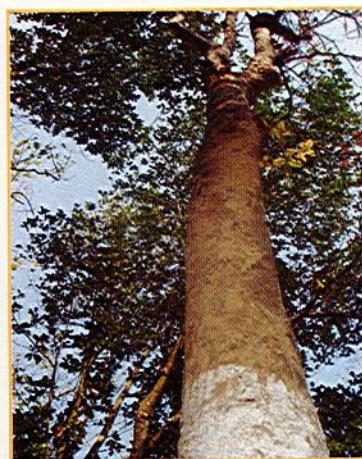
বীজ সংগ্রহ ও বপন পদ্ধতি: মার্চ-এপ্রিল মাসে পরিপূর্ণ বীজ গাছ হতে সংগ্রহ করা যায়। বীজ সংগ্রহের পর ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ৬ - ১২ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা ৩০০ - ৫০০ টি। বীজ বপনের পূর্বে ৪৮ ঘণ্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখে সরাসরি পলিব্যাগে বা নাসারি বেড়ে বপন করা হয়। বীজ সামান্য তেরছা করে প্রায় ১ সে. মি. মাটির নিচে বপন করতে হয়। বীজ দেয়ার পর খড় বা ছন দিয়ে ঢেকে দিলে অঙ্কুরোদগম তাড়াতাড়ি হয়। সাধারণত: ১০ - ১৫ দিনের মধ্যে বীজ গজানো শুরু হয়।



ছবি - ৬৫.১: অর্জুন ফল ও বীজ



ছবি - ৬৫.২: অর্জুন চারা



ছবি - ৬৫.৩: অর্জুন গাছ

চারা রোপণ পদ্ধতি: ৮ - ৯ মাস বয়সী চারা মাঠে রোপনের জন্য উপযুক্ত। ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা লাগানো ও অনেক সময় রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে বেশী দূরত্বে অর্জুন চারা লাগানো যায়।

৪৭. বহেরা - *Terminalia bellerica*

বর্ণনা: শাখা প্রশাখাযুক্ত বৃহদাকার পাতাবরা বৃক্ষ। উচ্চতায় ৪০ মিটার মত হয়। পাতা সরল, ডালের আগায় ঘনভাবে সজ্জিত। পাতা ৮ - ২০ সে. মি. লম্বা ও ৫ - ১০ সে. মি. চওড়া। অব্স্তুক ফুল একক মণ্ডুরীতে বিন্যস্ত। ফুল প্রায় ২-৩ সে. মি. লম্বা, ডিম্বাকার।

প্রাণিস্থান: বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। মিশ্র পাহাড়ি বনের শুকনা স্থানে ও মধুপুর শাল বনে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: হালকা বাদামী রং এর পাকা ফল গাছের তলা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। একটি ফলে একটি বীজ থাকে। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা প্রায় ২০০ - ২৫০ টি। সাধারণ তাপমাত্রায় শুক স্থানে বীজ ৬ - ১২ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

বীজ বপন: মার্চ মাসে বীজ বপন উভম। বপনের আগে বীজকে প্রথমে পানিতে ৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে পরে রোদে শুকিয়ে আবার ভিজানোর পর বপন করতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৮০ - ৯০ ভাগ এবং অঙ্কুরোদগমে সময় নেয় ১০ - ১২ দিন।



ছবি - ৬৬.১: বহেরা ফল



ছবি - ৬৬.৩: বহেরা গাছ



ছবি - ৬৬.২: বহেরা চারা

চারা রূপণ: বৃষ্টি শুরুর সাথে সাথে বা জুন - জুলাই মাসে চারা, স্টাম্প বা বীজ সরাসরি রূপণ করা যায়। এক বছর বয়সের চারা লাগানোই উভম।

৪৮. হরিতকি - *Terminalia chebula*

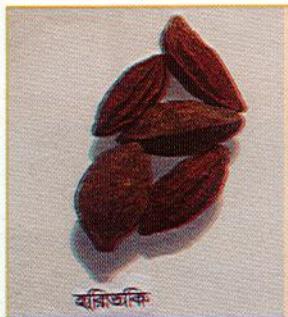
বর্ণনা: মধ্যম থেকে বৃহদাকারের পাতা বরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ২০ - ৩০ মিটার পর্যন্ত হয়। বাকল গাঢ় বাদামী। পাতা লম্বাটে থেকে উপবৃত্তাকার, ৭ - ১৮ সে. মি. লম্বা ও ৫ - ১০ সে. মি. চওড়া। ফল সাদা অথবা হলুদ ফুল পল্লবের শীর্ষ মঞ্জুরীতে বিন্যস্ত।

প্রাণিস্থান: দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক বনে ও এক সময় হরিতকি গাছ পাওয়া যেত।

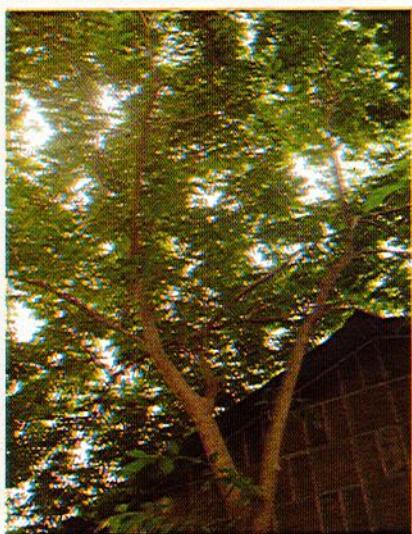
বীজ সংগ্রহের সময়: মার্চ - এপ্রিল।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি ও সংরক্ষণ: পাকা ফলের রং কমলা-বাদামী এবং ফলের গায়ে ৫ টি কালো দাগ থাকে। ফল পাকলে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যায় এবং গাছের তলা থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ফল ভালোভাবে শুকানোর পর ১ বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি কেজিতে ১৫০ - ১৬০ টি বীজ হয়।

বীজ বপন: মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ নার্সারি বেড়ে বা পলিব্যাগে বপন করতে হবে। বীজ বপনের আগে প্রথমে পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে পরে রোদে শুকিয়ে আবার ভিজিয়ে তা বপন করতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৬০ ভাগ এবং তা সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে ১০ - ২০ দিন।



ছবি - ৬৭.১: হরিতকি ফল



ছবি - ৬৭.৩: হরিতকি গাছ



ছবি - ৬৭.২: হরিতকি চারা

বীজ বা চারা রূপণ: বর্ষার প্রারম্ভে এক বছর বয়সী চারা লাগানোই উত্তম। বীজ সরাসরি থালি বা গর্ত করেও লাগানো যায়।

৪৯. তুন, সুরঞ্জবেদ - *Toona ciliata*

বর্ণনা: মধ্যম আকৃতির পত্রবরা বৃক্ষ, ২০ - ৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। বাকল ধূসর, বাদামী বর্ণের। পাতা ঘোগিক, ৩০ - ৬০ সে. মি. লম্বা। পত্রফলক ১০ - ২০ টি, বর্ণাকৃতির, ৫ - ১২ সে. মি. লম্বা। সুস্থান যুক্ত ছোট ছোট ফুল শাখাস্থিত পুষ্প মঞ্জুরীতে বিন্যস্ত।

প্রাণিস্থান: বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে বেশী পাওয়া যায়। এটি গ্রামীণ বনের ও একটি সাধারণ গাছ।

বীজ সংগ্রহের সময়: এপ্রিল - জুন।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বগন: ফল ক্যাপসুল এবং পরিপক্ব ফল ফেটে ছোট পাতলা পাখাযুক্ত বীজ বাতাসের সাথে উড়ে যায়। ফল ২.৫ সে. মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। পরিপক্ব ফল রোদে শুকালে ফল ফেটে বীজ বের হয়। প্রতি কেজিতে বীজের পরিমাণ প্রায় ১৪০,০০০ - ১৫০,০০০ টি। বীজ ট্রেতে গজানোই উত্তম এবং ২ পাতা বিশিষ্ট হলে পলিব্যাগে স্থানান্তরিত করা যায়। বীজ অঙ্কুরোদগম কাল ৮ - ১০ দিন এবং অঙ্কুরাদগমের হার প্রায় ৫০%।



ছবি - ৬৮.১: তুন ফল ও বীজ



ছবি - ৬৮.৩: তুন গাছ



ছবি - ৬৮.২: তুন চারা

চারা রোপণ: বর্ষার প্রারম্ভে এক বছর বয়সী চারা লাগানোই উত্তম।

৫০. আরশল, গুদা - *Vitex glabrata*

বর্ণনা: মাঝারি ধরনের পত্রহরিত বৃক্ষ। প্রায় ১৫ - ২০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। অনেক সময় কাণ্ডের নিচের দিকে অধিমূল থাকে। পাতা ঘোগিক, বৃন্তের অগ্রভাগে পাঁচটি পত্রফলক সজ্জিত থাকে, বোটা ১৩ সে. মি. চওড়া। সুস্থান সাদা ফুল কচি পাতার কঙ্ক মঞ্জুরীতে বিন্যস্ত থাকে। ফল রসালো, ১.৫ - ১.৭ সে. মি. লম্বা।

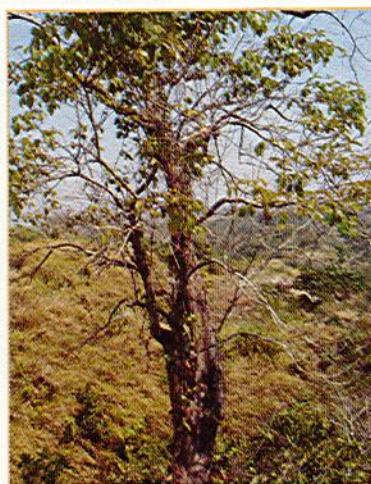
প্রাণিস্থান: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: মে - জুলাই।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বপন: বীজ সংগ্রহ করে সরাসরি পলিব্যাগ বা নর্সারি বেড়ে বপন করা যায়।



ছবি - ৬৯.১: আরশল চারা



ছবি - ৬৯.২: আরশল গাছ

চারা রূপণ: এক বছর বয়সের চারা বৰ্ষার প্রারম্ভে লাগানো যায়।

৫১. বাজনা - *Zanthoxylum rhetsa*

বর্ণনা: মধ্যমাকৃতির পত্রবরা বৃক্ষ, কাণ্ডের শাখা প্রশাখার গায়ে কঁটা বিদ্যমান। বাকল নরম, অনেকটা স্পঞ্জের ন্যায়। পাতা ঘোগিক, পল্লবের অঙ্গভাগে সজিত। পত্রফলক ১৬ - ২৫ টি, ৭ - ১৫ সে. মি. লম্বা, অনেকটা ঝাঁঝালো গন্ধের।

প্রাণিস্থান: পাতা ঝারা পাহাড়ী বন ও শালবনের প্রান্তদেশে পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলেও মাঝে মাঝে এ গাছ জন্মাতে দেখা যায়।

বীজ সংগ্রহের সময়: আগস্ট - অক্টোবর।

বীজ সংগ্রহের পদ্ধতি, সংরক্ষণ ও বীজ বপন: পরিপক্ষ ফল হতে সরাসরি বীজ সংগ্রহপূর্বক পট বা ব্যাগে বীজ বপন করা যায়। বীজত্বক শক্ত বিধায় বীজ বপনের পূর্বে গরম পানি বা পাতলা এসিডে শোধন করা হলে বীজ গজানোর হার বৃদ্ধি পায়।



ছবি - ৭০.১: বাজনা বীজ



ছবি - ৭০.২: বাজনা চারা



ছবি - ৭০.৩: বাজনা গাছ



ছবি - ৭০.৪: বাজনা কাণ্ড

চারা রূপণ: বর্ষার প্রারম্ভে জুন - জুলাই মাসে এক বছর বয়সী চারা লাগানো যায়। অনেক সময় থালিতে ও সরাসরি বীজ বপনের মাধ্যমে গাছ লাগানো যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- এম. আর. চৌধুরী, ১৯৭৫. নার্সারি এবং প্লান্টেশন ম্যানুয়েল, বন বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা।
- সৈয়দ সালামত আলী, এ. এইচ. আকন্দ এবং ডি. সি. ম্যাগনো, ১৯৯১. সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও বাগান সৃজন পদ্ধতি নির্দেশিকা, উপজেলা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প, বন বিভাগ, ঢাকা বাংলাদেশ।
- এস. এম. হাসান এবং এ. টি. এম. এমদাদ হোসেন, ১৯৯৩. ভূমির উপযুক্ততার ভিত্তিতে বৃক্ষ প্রজাতি নির্ধারণের সহজ পদ্ধতি, বাংলাদেশ বন গবেষনা ইনসিটিউট, চট্টগ্রাম।
- কামাল সিদ্দিকি এবং সৈয়দ সালামত আলী, ১৯৯৪. বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ম্যানুয়েল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।
- মোহাম্মদ আবুল হাসান, ২০০০. বায়োডাইভার্সিটি এ্যান্ড কনজারভেশন, হাসান বুক হাউস, ঢাকা।
- Lars Schmidt**, 2000. Guide to Handling of Tropical and Subtropical Forest Seed, Danida Forest Seed Centre.
- M. S. Khan, M. M. Rahman and M. Arshad Ali**, 2001. Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh, Bangladesh National Herbarium, Dhaka.
- D. K. Das and M. K. Alam**, 2001. Trees of Bangladesh. Bangladesh Forest Research Institute, Chittagong.
- এ. বি. এম. জাওয়ায়ের হোসেন, ২০০২. সামাজিক বনায়ন ও বন ব্যবস্থাপনা, মিসেস আখতার জাহান, ২/এফ, ২/১ মিরপুর, ঢাকা।
- অন্যান্য, ২০০৮. নাসরী ও প্লান্টেশন ম্যানুয়েল, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- আই. ইউ. সি. এন, ২০০৫. উত্তিদ নাসরী - পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা সহায়িকা, আই. ইউ. সি. এন. বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।

চরোল

রেল

মুটক পাতা



প্রকাশনায়
আরণ্যক ফাউন্ডেশন
মার্চ ২০০৮

